STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

মার্চ ২০১৭
নবপর্যায় ৪৭
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

৭ ও ৮ এপ্রিল ঐক্য পরিষদের ত্রিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলন

॥ মনীন্দ্র কুমার নাথ ॥

জাতীয় রাজনীতির এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে আগামী ৭ ও ৮ এপ্রিল ২০১৭ শুক্রবার ও শনিবার ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৯ম ত্রি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন। দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলনের প্রথম দিন ৭ এপ্রিল হবে উদ্বোধনী অধিবেশন, র‍্যালী, সাধারণ অধিবেশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে অংশ নেবেন। দ্বিতীয় দিন ৮ এপ্রিল হবে কাউন্সিল অধিবেশন। দেশ-বিদেশের প্রচুর সংখ্যক কাউন্সিলার ও ডেলিগেট এতে যোগদান করবেন।

ত্রিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে ঐক্য পরিষদের বক্তব্যে বলা হয়েছে, এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মধ্যে গোটা দেশ ও জাতি এগিয়ে চলেছে। বিদ্যমান সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে আবার ধর্মতন্ত্রও আছে। জাতীয় প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, উন্নয়নও হচ্ছে প্রায় সর্বক্ষেত্রে তবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অব্যাহতভাবে কমছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স'র ঘোষণা আছে, একই সাথে তৃণমূলে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, হুমকি, হামলা অতীতের মতই অব্যাহত আছে। অর্পিত সম্পত্তি ভুক্তভোগীদের প্রত্যর্পণে আইন আছে কিন্তু বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তও আছে। ১৯ বছর পেরিয়ে গেলেও পার্বত্য শান্তিচুক্তির আজও বাস্তবায়ন ঘটলো না। মন্ত্রী পরিষদের বিশাল বহর আছে কিন্তু একজন সংখ্যালঘুও পূর্ণমন্ত্রীত্বে নেই। সরকারি কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দৃশ্যমান ইতিবাচক অগ্রগতি আছে কিন্তু ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের কোন পরিবর্তন নেই। সংখ্যালঘুদের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হলেও জনপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ রক্ষক নয় বরং ভক্ষকের ভূমিকায়। যুদ্ধাপরাধের বিচার চলছে, কয়েকজনের ফাঁসিও হয়েছে তবে একই সাথে পাকিস্তানি কায়দায় সাম্প্রদায়িক অপশক্তির মেলবন্ধনে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়েছে। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার শ্লোগান আছে তবে একই সাথে ধর্মমন্ত্রণালয়ের বাজেটে পাহাড়সম বৈষম্যও আছে। ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক কিন্তু ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ধর্মশিক্ষার জন্যে বিদ্যালয়ে আজও ধর্মীয় শিক্ষকের নিয়োগ নেই। দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে খানিকটা অগ্রগতি ঘটলেও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতি আজও চলমান। কথিত ধর্মীয় অবমাননার মিথ্যা ধুয়া তুলে প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘুদের হয়রানী করা হচ্ছে। অব্যাহতভাবে দেশত্যাগের শুধু হুমকি নয়, দেশত্যাগে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে। স্বাধীনতা-পূর্বকালের চেয়েও সংখ্যালঘু জনমনে অধিকতর নিরাপত্তাহীনতা ও আস্থাহীনতা আজ তাকে ক্রমশঃ-ই নির্জীব, নিস্ক্রিয় ও পলায়নপর করে তুলেছে। মোদ্দা কথা, এ দেশের আড়াই কোটি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। এ থেকে মুক্তি প্রয়োজন দেশের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে, রক্তার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে, জাতীয় সমৃদ্ধির স্বার্থে, বৈচিত্র্যের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের স্বার্থে, উপমহাদেশজুড়ে শান্তির বাতাবরণ ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে।

এহেন তাগিদবোধ থেকেই বিগত ৪ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষাধিক জনতার মহাসমাবেশে গৃহীত হয় সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ৭ দফা। অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং সাংবিধানিক সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষে এ দাবির ভিত্তিতে মানবাধিকারের আন্দোলন জোরদার করা ছাড়া আজকের দিনে বিকল্প কোন পথ আজ আর খোলা নেই।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সকল জেলায় সাংগঠনিক কার্যক্রম ব্যাপক গতিশীলতা লাভ করেছে। বেশ কয়েকটি জেলায় মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিসমূহ

পৃষ্ঠা ৩

জাতীয় ঐকমত্যের ৭ দফা দাবি ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়

এক নজরে সম্মেলন

১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক নজরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সম্মেলনসমূহ :

প্রথম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ১৯৮৯ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন
দ্বিতীয় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ১৯৯২ রমনা গ্রীণ
তৃতীয় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ১৯৯৫ রমনা গ্রীণ
চতুর্থ ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ১৯৯৮ পল্টন ময়দান
পঞ্চম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০১ পল্টন ময়দান
ষষ্ঠ ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০৫ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন
সপ্তম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০৯ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন
অষ্টম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১৩ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন
নবম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১৭ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন

প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা বাস্তবায়নে বাধা আইনমন্ত্রী !

কাজল দেবনাথ

শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি নিয়ে এদেশের আমলা-রাজনীতিবিদরা বহুদিন যাবৎ সাপলুডু খেলে চলেছেন এ মাটির ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ে। দুঃখজনক হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি এ খেলায় এক শ্রেণির আমলা-রাজনীতিবিদরা বিষধর সাপ ও আমরা সংখ্যালঘুরা গুটি এবং ইতিমধ্যেই এরা পার করে দিয়েছেন ৫০টি বছর। একটির পর একটি ছোবলে বারবার সাপের লেজে ফিরে এসে আবার প্রথম হতে যাত্রা শুরু করে শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তির দাবিদার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যারা পৈতৃক সম্পত্তির মালিক, তারা আজ সর্বস্বান্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছায় এই অভাগা সম্প্রদায় যখন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের শেষ স্তর পেরিয়ে দীর্ঘ ৫০ বছর পর আপিল আদালতের চূড়ান্ত রায়ে ফেরত পেতে চলেছেন তাদের পৈতৃক সম্পত্তি, তখনই আইন মন্ত্রী শেষ ছোবলটি মেরে আমাদের আবার ফেরত পাঠাতে চান সাপের লেজে অর্থাৎ প্রথম ঘরে।

একটু খোলাসা করেই না হয় বলি– ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর ৬ হতে ২২, এই ১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধ। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ জারি হলো ডিফেন্স অব পাকিস্তান আইনের অধীনে শত্রু সম্পত্তি অর্ডিনেন্স। পাকিস্তান ও ভারত এই দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে হলো যুদ্ধ, আর তার খেসারত দিল এবং বিগত ৫০ বছর যাবৎ দিয়ে চলেছে মূলত একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। স্পষ্ট করে বললে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়। শুধু তাই নয়, একই সাথে এদের কপালে লেপন করা হলো শত্রু তিলক এবং পৈতৃক ভিটে হলো শত্রু সম্পত্তি।

অবিভক্ত ভারত হতে দখলদার ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে এ ভূখণ্ডে মূলত এরাই দিয়েছে আত্মাহুতি, দিয়েছে নেতৃত্ব। এদের অন্যতম মাস্টারদা সূর্যসেনের ভিটাও আজ শত্রু সম্পত্তি। ১৯৪৭-এ ভাগ হলো ভারত। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুটি প্রদেশ। পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে হাজার মাইলের দূরত্ব। এই দূরত্ব কি শুধু মাইলের ? উত্তর পেতে সময় লেগেছে মাত্র একটি বছর। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। প্রতিবাদে ফেটে পড়ল ছাত্র সমাজ। সাথে সচেতন নাগরিক। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিল বাঙালি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিল উত্থাপন করলেন কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কুমিল্লা সেনানিবাসে ঘাতক পাকিস্তান বাহিনী বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারল এই মহান নেতাকে বাংলার মাটিতে। প্রাণ দিলেন ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তার সম্পত্তিও নাকি শত্রু সম্পত্তি?

পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদে মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ধর্মভিত্তিক সংরক্ষিত আসন ছিল ৭২টি। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে দেশের এই শত্রুরা (?) তাদের সংরক্ষিত ৭২টি আসন ছেড়ে দিয়ে মূলধারায় মিশে সৃষ্টি করেছিল এক ইতিহাস। পরবর্তীতে '৬৬, '৬৯, পেরিয়ে '৭১-এর ৭ মার্চ, ২৫ মার্চের কালোরাত, নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ, এক কোটি শরণার্থী এবং ত্রিশ লাখ প্রাণ আর দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত হলো লাল-সবুজ পতাকা খচিত বাংলাদেশ। বাঙালি গেয়ে উঠল–'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' প্রতিটি আন্দোলনের প্রথম সারিতে থেকেও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের কপালে শত্রু তিলক কিন্তু রয়েই গেল। যদিও '৬৫ সালের 'শত্রু ভারত' '৭১-এ হলো 'মিত্র ভারত'। তাদের নিয়ে গঠিত হলো মিত্রবাহিনী। পরাজিত পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করল এই মিত্রবাহিনীর কাছে। ইতিহাস বদলায়, অবস্থান বদলায়, শুধু বদলায়নি হিন্দুদের কপালের শত্রু তিলক। স্বাধীনতার পর শত্রু সম্পত্তি হলো অর্পিত সম্পত্তি। বদল হলো শুধু নাম, ভেতরের দাড়ি-কমাসহ সব অনুচ্ছেদ রইল হুবহু এক।

এর পরের ইতিহাস আরও করুণ। সুপ্রিম কোর্ট অন্তত ডজনখানেক রায় দিয়েছে অর্পিত সম্পত্তি আইন ২৩.৩.৭৪ হতে মৃত, "Since the law of enemy property itself died with the repeal of Ordinance No. 1 of 1969 on 23.3.1974 no further Vested Property case can be started thereafter on the basis of the law which is already dead." সুতরাং এ আইনের আওতায় নতুন কোনো সম্পত্তি অর্পিত হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না। এরপরও, যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল হয়েছে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী, বাতিল হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার, পাশ হলো পঞ্চদশ সংশোধনী, সেই সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আমলাতন্ত্র ২৩.৩.৭৪-এর পরও প্রতিদিন তালিকাভুক্ত করেছে অর্পিত সম্পত্তি।

শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ পরিষদ-এর উদ্যোগে প্রথম আন্দোলন শুরু হয় ১৯৭৯-এ এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল শক্তিকে নিয়ে একটানা সংগ্রাম করে চলেছে। এই গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের প্রথম ফসল ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের শেষদিকে সংসদে আইনটি পাস হওয়ায় সময়ের অভাবে ১৮০ দিনের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির গেজেট প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ২০০২ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এক সংশোধনীর মাধ্যমে গেজেট প্রকাশের সময়সীমা অনির্দিষ্ট কাল এবং একই সাথে গেজেট প্রকাশের আগে লুক্কায়িত সম্পত্তি খুঁজে খুঁজে বের করে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণার নির্দেশ প্রদান করায় আইনটি কার্যত স্থগিত হয়ে যায় এবং সংখ্যালঘু নিপীড়নের ধারা অব্যাহত থাকে।

২০০১ সালের আইনে আমলাদের কূটচালে এবং কারসাজিতে বলা হয়েছিল সম্পত্তি ফেরত পেতে প্রার্থীকে অবশ্যই অব্যাহতভাবে বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে। অর্থাৎ প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে যে, ১৯৬৫ সাল হতে তিনি অব্যাহতভাবে বাংলাদেশে ছিলেন। একটি শব্দ বাদ

পৃষ্ঠা ৩

> কার্যত এই রিট করার পরামর্শ দিয়ে আইন মন্ত্রী অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে জননেত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছাকে এমন এক গভীর খাদে ফেলে দিয়েছেন যা থেকে আগামী ১০/১৫ বছরেও উঠে আসা সম্ভব হবে না।

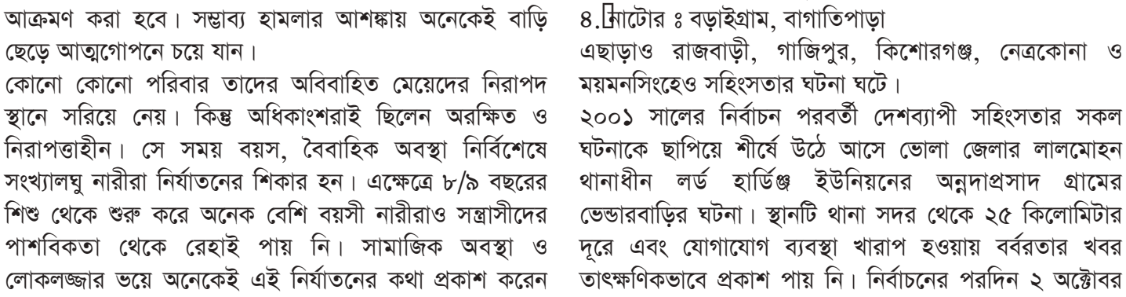
বরিশাল বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা
বরিশাল বিভাগ
প্রধান অতিথিঃ অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক সাবেক রাষ্ট্রদূত

বরিশালে ঐক্য পরিষদের বিভাগীয় প্রতিনিধি সভায় নেতৃবৃন্দ ছবি : পরিষদ বার্তা

ঐক্য পরিষদের ত্রি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন সফল করার আহ্বান

॥ বরিশাল থেকে প্রতিনিধি ॥

গত ১০ মার্চ বরিশালে বড় কালীমন্দিরে ঐক্য পরিষদের বিভাগীয় প্রতিনিধি সভায় আসন্ন ত্রি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন সফল করে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এ্যাড. মানবেন্দ্র বটব্যালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সিনিয়র সদস্য অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুখেন্দু শেখর বৈদ্য। সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. হিরেন কুমার দাস, মহানগর ঐক্য পরিষদের সভাপতি মৃণাল কান্তি সাহা ও সাধারণ সম্পাদক লিটু দত্ত, কেন্দ্রীয় নেতা নিহার হালদার ও বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ।

সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জাতীয় সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনের সাফল্যের ওপর আগামী দিনে ঐক্য পরিষদের অগ্রযাত্রা নির্ভর করে।

অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিক বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মূল ধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঐক্য পরিষদকে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ঐক্য পরিষদ মুক্তিযুদ্ধের মূল ধারার একটি পরিপূরক সংগঠন। তবে আমাদের অস্তিত্ব ও অধিকারের প্রশ্নে কোনো আপোস হবে না।

আমার আমি

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

প্রশিক্ষিত জনশক্তির শূন্যতা লুটেরা অর্থনীতির গড়ে উঠার সুযোগ-সম্ভাবনাকে বাড়-বাড়ন্ত করে তোলে।

সদ্য স্বাধীন মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত একাত্তরের স্বাধীন দেশটির ১৬ ডিসেম্বরের পর পরিচালক হয়ে উঠেন আমলাতন্ত্র যার সিংহভাগ ছিল পাকিস্তানি ধাঁচের। (পাকিস্তান সৃষ্টির পরও আমলাতন্ত্রই ছিল প্রকৃত শাসক তথা প্রভু)। এই আমলাতন্ত্রের সদস্যদের মধ্যে যারা স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন তাদের পক্ষে পাকিস্তানের শাসকচক্র এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রতিহত করে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ সঠিকভাবে পুর্ণগঠনের কাজ অপ্রতিবোধ্য চালিয়ে যাওয়ার মন-মেজাজ আদর্শগত দৃঢ়তা অধিকাংশের মধ্যে ছিল না, উলেখযোগ্যদের মধ্যে ছিল পাকিস্তানী সমস্তত্ব ও মতাদর্শ। এক কথায় যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রাক-প্রস্তুতির অভাব, সচেতন বিষয়ীগত উপাদানের অনুপস্থিতি, সঠিক মানসিকতার ঘাটতির বাংলাদেশ পতন-বন্ধুর পথ ধরে এগিয়ে চলেছে, পদে পদে পদস্থলন হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভোগ করছে দুভোর্গ, তাদের সুদিনের আশা দৃশ্যমান হয় না, পাকিস্তানী ধরণের শোষণ-বঞ্চনার সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব বাজারী লুটপাটের তাণ্ডব, রাষ্ট্রের দখলদারী ক্রমাগত চলে যাচ্ছে লুটেরা ধনী ব্যাঙ্কডাকাত, ভূমিদস্যু ও অসৎ আমলাতন্ত্রের খপ্পরে।

একথা অসত্য নয়, ভ্রান্ত ও ভুল পদক্ষেপের ফল দেশবাসীকে ভোগ করতেই হবে। এ ভোগান্তি এড়ানোর পথ নেই। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এবং বামপন্থীদের এ দুভোর্গের দায় কাঁধে নিতেই হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা লগ্নের এই ভুলের মাশুল থেকে শুরু হওয়া ভ্রান্তিবিলাসে ডুবে থাকলে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও বিকাশে জন্য দরকার ইতিহাসের পূর্ণমূল্যায়ন। এই বিপদ-সংকুল পথ পরিহারের এক নির্মোহ অভিযাত্রা আজকের প্রয়োজন।

(চলবে)

সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ : নির্বাচনকালীন সহিংসতা ও অন্যান্য অনুসঙ্গ

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ শুরু হলেই শুরু হয় নির্যাতন। জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করে। রাস্তায় তাদের অনুসরণ করা হয়। সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগকেই ভোট দেয় এই বদ্ধমূল ধারণা থেকেই ঘোষণা দেওয়া হয় আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার কারণে তাদের উপর আক্রমণ করা হবে। সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কায় অনেকেই বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপনে চয়ে যান।

কোনো কোনো পরিবার তাদের অবিবাহিত মেয়েদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়। কিন্তু অধিকাংশরাই ছিলেন অরক্ষিত ও নিরাপত্তাহীন। সে সময় বয়স, বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে সংখ্যালঘু নারীরা নির্যাতনের শিকার হন। এক্ষেত্রে ৮/৯ বছরের শিশু থেকে শুরু করে অনেক বেশি বয়সী নারীরাও সন্ত্রাসীদের পাশবিকতা থেকে রেহাই পায় নি। সামাজিক অবস্থা ও লোকলজ্জার ভয়ে অনেকেই এই নির্যাতনের কথা প্রকাশ করেন নি কিংবা আইনের আশ্রয় নেন নি।

এসময় দেশের নগর এলাকার তুলনায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিশেষত নদীবেষ্টিত অঞ্চলে নির্যাতনের ঘটনা বেশি ঘটেছিল। তার একটি অন্যতম কারণ ছিল নির্বাচন উপলক্ষে সংবাদ সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের জন্য অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা দেশে অবস্থান করছিলেন এবং তারা মূলত শহর এলাকাতে অবস্থান করছিলেন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দুর্গমতার কারণে তারা যেতে পারেন নি। নির্যাতনের খবর বিশ্ব মিডিয়ার প্রকাশের ভয়ে শহরে নিরাপত্তা জোরদার করা হলেও প্রত্যন্ত এলাকায় প্রশাসন ছিল নিষ্ক্রিয়। তখন দেশের যে স্থানগুলোতে সবচেয়ে বেশি সহিংস ঘটনা ঘটে সেগুলো হলোঃ

বরিশাল বিভাগ ঃ

১.ভোলা ঃ লালমোহন, ভোলা সদর, তজুমদ্দিন, চরফ্যাশন, বোরহান উদ্দিন, দৌলতখান
২.বরিশাল ঃ সদর, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া
৩.পটুয়াখালী ঃ সদর, দুমকি, মির্জাগঞ্জ ও বাউফল
৪.পিরোজপুর ঃ পিরোজপুর সদর, নাসিরাবাদ, স্বরূপকাঠি ও নজিরপুর
৫.ঝালকাঠি ঃ নলছিটি, রাজাপুর, কাঁঠালিয়া

খুলনা বিভাগ ঃ

১. বাগেরহাট ঃ বাগেরহাট সদর, রামপাল, মোলাহাট, শরণখোলা, কচুয়া
২.ঝিনাইদহ ঃ কালিগঞ্জ, হরিণাকুণ্ড
৩.যশোর ঃ ঝিকরগাছা, চৌগাছা, কেশবপুর
৪.কুষ্টিয়া ঃ দৌলতপুর

চট্টগ্রাম বিভাগ ঃ

১.চট্টগ্রাম ঃ বাঁশখালি, মিরেশ্বরাই, রাউজান, সন্দ্বীপ, সাতকানিয়া
২.ফেনি ঃ সোনাগাজী, দাগনভূইয়া
৩.কুমিল্লা ঃ নাঙ্গল কোর্ট, চৌদ্দগ্রাম
৪.খাগড়াছড়ি ঃ রামগড়

রাজশাহী বিভাগ ঃ

১.সিরাজগঞ্জ ঃ সদর, কাজীপুর, উলাপাড়া
২.পাবনা ঃ সুজানগর, চাটমোহর
৩.রাজশাহী ঃ বাগমারা, পুটিয়া
৪.নাটোর ঃ বড়াইগ্রাম, বাগাতিপাড়া

এছাড়াও রাজবাড়ী, গাজিপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহেও সহিংসতার ঘটনা ঘটে।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী দেশব্যাপী সহিংসতার সকল ঘটনাকে ছাপিয়ে শীর্ষে উঠে আসে ভোলা জেলার লালমোহন থানাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের ভেন্ডারবাড়ির ঘটনা। স্থানটি থানা সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় বর্বরতার খবর তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পায় নি। নির্বাচনের পরদিন ২ অক্টোবর অন্নদাপ্রসাদ ও আশেপাশের গ্রামের সংখ্যালঘু নারীরা নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল চারিদিকে ধানক্ষেত ও জলাভূমি বেষ্টিত ভেন্ডারবাড়িকে। প্রায় অর্ধশত নারী তাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সেখানে আশ্রয় নিলেও শত শত বিএনপি দলীয় সন্ত্রাসীদের কবল থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে নি। সন্ত্রাসীরা ৮/১০টি দলে বিভক্ত হয়ে ঐদিন রাত ১০টার দিকে সেখানে হামলা চালায়। অনেক নারী সম্ভ্রম রক্ষার্থে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অন্ধকারে পার্শ্ববর্তী জলাশয় ও ধানক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন তাদের শিশুদের জলাশয়ে ছুড়ে ফেলার হুমকি দিয়ে তাদেরকে জলাশয় ও ধানক্ষেত থেকে উঠে আসতে বাধ্য করে সন্ত্রাসীরা। এভাবে ধর্ষিত হয়েছে আট বছরের শিশু; লাঞ্ছিত হয়েছে ৬৫ বছরের বৃদ্ধা; মা, মেয়ে, শাশুড়ি, পুত্রবধুকে ধর্ষণ করা হয়েছে এক সাথে। ছেলের চেয়েও ছোটো বয়সী সন্ত্রাসী কর্তৃক মায়ের বয়সী নারী ধর্ষিত হয়েছে। এসব নির্যাতিত নারীদের অনেকেই বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন।

উক্ত নির্বাচনের ১ সপ্তাহ পরে (৮/১০/২০০১) গণধর্ষণের শিকার হয় সিরাজগঞ্জের সংখ্যালঘু কিশোরী পূর্ণিমা রানী শীল।

(চলবে)

লেখক : সাধারণ সম্পাদক, মহিলা ঐক্য পরিষদ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ইন্দু নন্দন দত্ত ছবি : পরিষদ বার্তা

সংখ্যালঘু কমিশন ও মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

চন্দন মজুমদার ও রমা চৌধুরী। সম্মেলনে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার আওতাধীন বিভিন্ন উপজেলার কয়েকশ প্রতিনিধি ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ গড়তে হলে সব ধর্মের মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সমঅধিকার দিতে হবে। সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে। নূন্যতম ২০ শতাংশ হারে সংসদ সদস্য পদের সৃষ্টি করতে হবে। অবিলম্বে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ও পার্বত্য শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন করতে হবে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে ৭২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা বাস্তবায়নে বাধা আইনমন্ত্রী !

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং একটি শব্দ যোগ অর্থাৎ 'অব্যাহত' শব্দটি বাদ এবং তৎকালীন হিন্দু পরিবারগুলো যৌথ পরিবার ছিল বিধায় মালিকের সংজ্ঞায় 'সহ-অংশীদার' শব্দটি যোগ দেবার দাবিতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। এবার এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সংহতি প্রকাশ করে অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), আইন ও সালিশ কেন্দ্র, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, নিজেরা করি, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও এইচ ডি আর সি এবং সবাইকে নিয়ে গঠিত হয় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল। দশ বছর পর ২০১১ এবং ২০১২ সালে এলো কয়েকটি সংশোধনী। প্রধানমন্ত্রীকে এবারও বোঝানো হলো অব্যাহত শব্দটি বাদ দিলে ভারত হতে হিন্দুরা দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে সম্পত্তি ফেরত পেতে। আমলাদের এই অবাস্তব সংশয় উপেক্ষা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অব্যাহত শব্দটি বাদ এবং সহঅংশীদার শব্দ যোগ করলেও আমলাদের কুপরামর্শে আবারও বিভ্রান্ত হলেন। জোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো 'ক' এবং 'খ' দুটি তালিকা। অর্থাৎ যেসব সম্পত্তি সরকার দখলে নিয়েছে এবং লিজ দিচ্ছে তা হবে 'ক' তালিকাভুক্ত এবং যেসব সম্পত্তিতে সরকারের দখল না থাকলেও শুধুমাত্র তহশিলদার ও এসি ল্যান্ডের কূটচাল এবং ঘুষ বাণিজ্যে পেন্সিলে/কলমে খাতার পাশে লেখা হয়েছে অর্পিত বা ভিপি তা হবে 'খ' তালিকাভুক্ত। সরকারি হিসেবে 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ১,৯২,৬২৮ একর এবং 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি ৬,৭৪,৭৯৮ একর। ২০০১ সালের আইনে কেবলমাত্র সরকারের দখলে থাকা সম্পত্তির একটি গেজেট প্রকাশ করার কথা ছিল। অর্থাৎ 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে সরকার সেসময় বিবেচনায় নেয়নি। এটি ছিল আমলাদের নতুন কূটচাল এবং এই চালে সরকারি হিসেবে নতুন করে ৬,৭৪,৭৯৮ একর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হলো। আইনমতে 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত হবে আদালতের মাধ্যমে এবং 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি স্থানীয় রাজনৈতিক কমিটির মাধ্যমে অথবা প্রার্থী চাইলে আদালতের মাধ্যমে। আমলারা প্রধানমন্ত্রীকে বোঝালেন আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতায়। সুতরাং হিন্দু সম্পত্তির সব খবরাখবর তারাই সবচেয়ে ভাল জানেন, কে দেশে আছে আর কে দেশত্যাগ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার শুরু হলো নতুন করে ভোগান্তি এবং রাজনৈতিক টাউটবাজি। সেই সাথে ঘুষ বাণিজ্য ও লক্ষ লক্ষ মামলায় জড়িয়ে শেষ সম্বলটুকু হারাতে বসলো হিন্দু সম্প্রদায়।

এই প্রেক্ষাপটে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ বিদ্যমান জটিলতা নিরসনে 'খ' তালিকা সম্পূর্ণরূপে বাতিলের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে ৭ আগস্ট ২০১৩ এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বহু-বিতর্কিত 'খ' তফসিল বাতিল হয় ৮ অক্টোবর ২০১৩। এটি ছিল বর্তমান সরকারের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

'খ' তালিকা বাতিল আইনে স্পষ্ট উলেখ আছে 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি এমনভাবেই বাতিল হয়েছে যে, উক্ত তপশীলভুক্ত সম্পত্তি কখনও অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত হয়নি। অর্থাৎ দেশের প্রচলিত আইনই প্রযোজ্য হবে কামাল এবং কমলের জন্য, কোনো বৈষম্য থাকবে না। আইনে এত স্পষ্ট ভাষা থাকা সত্ত্বেও ক'দিন পরপরই আমলারা একটির পর একটি সংশোধনী আনবার চেষ্টা চালিয়েছে। ক'মাস আগে 'ক' তালিকার নতুন একটি গেজেট প্রকাশের জন্য মন্ত্রী পরিষদে প্রস্তাব আনেন আমলারা। যুক্তি খাড়া করেন ৬ হাজার একর সম্পত্তি ভুলক্রমে 'খ' তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং কিছু সম্পত্তি তালিকা হতে বাদ পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তা ফেরত পাঠান। এতেও ক্ষান্ত হননি আমলাতন্ত্র। আবারও মন্ত্রী পরিষদে প্রস্তাব আনেন 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি ফেরত দিতে তহশিলদার/এসি ল্যান্ড 'স্বত্ব–নির্ধারণপূর্বক' স্বত্ববান ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে ভূমি রেকর্ড সংশোধন করবে। 'অব্যাহত বাংলাদেশী' নাগরিকের মতো আবারও একই চাল খেলতে চেয়েছিল আমলাতন্ত্র। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবার শুধু ক্ষুব্ধই হননি, ভর্ৎসনাও করলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আমলাদের এবং জানতে চান 'খ' তালিকা যেখানে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে সেখানে বার বার কেন নতুন করে জটিলতা সৃষ্টির জন্য একটি পর একটি প্রস্তাব আনা হচ্ছে। এবারও বিলটি ফেরত পাঠান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তবে নামজারী নিয়ে হয়রানির কিন্তু শেষ নেই। একই সাথে চলছে জমজমাট ঘুষ বাণিজ্য। অভিযোগ আছে, এমনকি সংশ্লিষ্ট সচিব–মন্ত্রী মহোদয়রাও স্বীকার করেন, প্রায় প্রতিটি জেলায় শতাংশ প্রতি এলাকাভিত্তিক ঘুষের হার নির্ধারণ করা আছে। এই হলো 'খ' তালিকার বর্তমান অবস্থা।

'ক' তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে আমলাতান্ত্রিক ধারাবাহিক প্রতিবন্ধকতা, জটিলতা ও হয়রানির সর্বশেষ নিদর্শন হলো, আপিল ট্রাইব্যুনাল আদালতের চূড়ান্ত রায় ও ডিক্রি অনুযায়ী বাদীকে সম্পত্তি ফেরত না দিয়ে জেলা প্রশাসকরা প্রথমে সরকারি আইনজীবীদের কাছে জানতে চান করণীয় কি? তাদের মতামতে প্রত্যর্পণের কথা বলা হলেও সম্পত্তি ফেরত না দিয়ে একই বিষয়ে মতামত জানতে আবার ভূমি মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়। উত্তরে ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসকদের জানায়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় ও ডিক্রিতে কোনও রকম অসঙ্গতি পরিলক্ষিত না হলে এবং এর মাধ্যমে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারি স্বার্থের কোনও ক্ষতি সাধিত না হলে উক্ত রায় ও ডিক্রি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ আদালতের চূড়ান্ত রায় সঠিক হয়েছে কিনা তার বিচারের ভার জেলা প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত করে ভূমি মন্ত্রণালয়, যা এক কথায় আদালত অবমাননার শামিল। উলেখ্য, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, যা জেলা প্রশাসক বাস্তবায়ন করবে।

এখানেই শেষ নয়– জেলা প্রশাসকরা পুনরায় একই বয়ানে বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে তাদের নির্দেশনা চেয়ে। আইন মন্ত্রণালয় সলিসিটিরের নিকট প্রেরণ করলে সলিসিটিরের মতামত হলো, আপিল ট্রাইব্যুনালই তথ্যগত এবং আইনগত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে বিধায় তাদের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে, এবং রায় বাস্তবায়নে কোনও আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই। প্রসঙ্গত উলেখ্য ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় ২৮.১০.২০১৫ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করে জানায় আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা আদেশ বা রায় বাস্তবায়ন করতে জেলা প্রশাসকদের নিকট হতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ অনভিপ্রেত এবং একই সাথে রায় বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয় ঐ পরিপত্রে। এত কিছুর পরও ১৩.১১.২০১৫ তারিখে মাননীয় আইনমন্ত্রী কোন বিবেচনায় রায় বাস্তবায়নের নির্দেশনা না দিয়ে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে সরকার পক্ষে রিট মামলা দায়ের করার মতামত জানিয়ে বিষয়টি রিট শাখায় প্রেরণ করা ও জেলা প্রশাসককে অবহিত করার নির্দেশ দেন তা আমাদের যারপর নাই বিস্মিত ও হতাশ করেছে।

৫০ বছর অপেক্ষার পর যখন সর্বস্বান্ত ভুক্তভোগী আদালতের চূড়ান্ত রায়েই শুধু নয়, সংশ্লিষ্ট সবার মতামতের প্রেক্ষিতে তার সম্পত্তি ফেরত পেতে চলেছে ঠিক সেই সময় আইনমন্ত্রী একদিকে সরকারের বিরুদ্ধে সরকারকে দিয়ে হাইকোর্টে রীট করার মতামত/পরামর্শ দিয়ে সাপলুডুর শেষ ছোবলটিই দিয়েছেন, অপরদিকে ১৯-১-২০১৬ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোকে বলেছেন 'এটি আইন মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশনা নয়। সলিসিটরের কার্যালয় থেকে পাঠানো বিষয়ে প্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রীর দেওয়া অনুশাসন মাত্র।' আরও বলেছেন 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে ট্রাইব্যুনালের রায়ই চূড়ান্ত। তাই এক্ষেত্রে সিভিল রিভিশন করার সুযোগ নেই। তবে সংক্ষুব্ধ হলে রিট করতেই পারে।' মাননীয় আইনমন্ত্রী আপনিই বলুন, আপনার এই স্ব-বিরোধী মতামতের পর কোন জেলা প্রশাসকের ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে তিনি আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়ন করবেন? অথবা আইনমন্ত্রী যে কূটচালটি দিয়েছেন তার সাথে তাল মিলিয়ে কেনই বা রায় বাস্তবায়ন না করার সুযোগটি নেবেন না? আইনমন্ত্রীর এই নির্দেশ/অনুশাসনের পর হতে সম্পত্তি হস্তান্তরের সকল কর্মকাণ্ড স্থগিত হয়ে আছে। জেলা প্রশাসকেরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এক কথায়, অর্পিত সম্পত্তি ফেরত পেতে আইনের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ফলাফল শূন্য। কার্যত এই রিট করার পরামর্শ দিয়ে আইন মন্ত্রী অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে জননেত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছাকে এমন এক গভীর খাদে ফেলে দিয়েছেন যা থেকে আগামী ১০/১৫ বছরেও উঠে আসা সম্ভব হবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী– 'খ' তালিকা বাতিলের মতো আবারও আপনার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের বোধহয় আর কোনো পথ খোলা রইল না। সাপলুডুতে সাপের ছোবলের পাশাপাশি মই–ও তো আছে। আর এটাতো পরীক্ষিত সত্য– আপনার হাতে থাকা সেই মই দিয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে আপনার নৌকার গুন টানা সৈনিকদের আপনি রক্ষা করেছেন বার বার। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আইন মন্ত্রীর এই শেষ ছোবল থেকে এবারও রক্ষা করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনিই আমাদের শেষ ভরসা।

লেখক : সদস্য, সভাপতিমণ্ডলী, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

ত্রিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিলুপ্ত করে সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম উত্তর, চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণ, রংপুর জেলা, গোপালগঞ্জ জেলাসহ বেশ কয়েকটি জেলায় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা মহানগর উত্তর ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জেলায় বিভিন্ন এলাকায় ইতোমধ্যে নেতৃবৃন্দের জনসংযোগ অব্যাহত রয়েছে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহকে অধিক সংখ্যক লোক সম্মেলনমুখী করার জন্য বিশেষ সাংগঠনিক কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে ইতোমধ্যে ঢাকার পার্শ্ববর্তী মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, বরিশাল, ফেনী, কুমিলা, নোয়াখালী জেলায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুরসহ ঢাকার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলায়ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

৭ এপ্রিল সকাল ১০টায় সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান। উদ্বোধন পর্বে থাকবেন, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও বেসরকারি বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি ও তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি ও জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান জি এম কাদের, ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি উষাতন তালুকদার এমপি ও হিউবার্ট গোমেজ। বিকেলে সাধারণ অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুলাহ আল নোমান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ঐক্য ন্যাপ সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, জাসদের অপর অংশের নেতা মইনউদ্দিন খান বাদল, বাসদের সভাপতি খালেকুজ্জামান, সাম্যবাদী দলের সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) কে এম শফিউলাহ বীরউত্তম, মানবাধিকার নেত্রী সুলতানা কামাল, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস, বিশিষ্ট কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন ও বক্তব্য রাখবেন বলে সম্মতি জানিয়েছেন।

নবম ত্রি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি ও উপ-কমিটি

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজের সভাপতিত্বে সংগঠনের স্থায়ী কমিটির সভায় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি ও উপ-কমিটি গঠিত হয়।

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি : আহ্বায়ক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ড. জিনবোধি ভিক্ষু ও নির্মল রোজারিও, সদস্য সচিব মনীন্দ্র কুমার নাথ।

অভ্যর্থনা সাব-কমিটি : আহ্বায়ক এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী , সদস্য সচিব ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়।

সাংগঠনিক ও যোগাযোগ সাব-কমিটি : আহ্বায়ক এ্যাড. তাপস কুমার পাল, যুগ্ম-আহ্বায়ক রবীন্দ্রনাথ বসু, সদস্য সচিব অধ্যক্ষ হরিচাঁদ মন্ডল সুমন।

অর্থ সাব-কমিটি : আহ্বায়ক জে.এল ভৌমিক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার, সদস্য সচিব গোপাল দেবনাথ।

মঞ্চ ও সাজসজ্জা সাব-কমিটি : আহ্বায়ক কাজল দেবনাথ, সদস্য সচিব সুখেন্দু শেখর বৈদ্য।

স্বেচ্ছাসেবক সাব-কমিটি : আহ্বায়ক জয়ন্ত কুমার দেব, যুগ্ম-আহ্বায়ক এ্যাড. শ্যামল কুমার রায় ও ব্রজগোপাল দেবনাথ, সদস্য সচিব রমেন মন্ডল।

র‍্যালি সাব-কমিটি : আহ্বায়ক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, সদস্য সচিব সাগর হালদার।

প্রচার সাব-কমিটি : আহ্বায়ক ডি.এন চ্যাটার্জী, সদস্য সচিব অংকুরজিত সাহা নব।

প্রকাশনা সাব-কমিটি : আহ্বায়ক বাসুদেব ধর, যুগ্ম-আহ্বায়ক নিখিল চন্দ্র শীল ও প্রিয়া সাহা, সদস্য সচিব বিধান দাশগুপ্ত।

দপ্তর সাব-কমিটি : আহ্বায়ক মিলন কান্তি দত্ত, যুগ্ম-আহ্বায়ক উত্তম কুমার চক্রবর্তী, সদস্য সচিব দিপংকর ঘোষ।

আপ্যায়ন সাব-কমিটি : আহ্বায়ক জয়ন্ত সেন দিপু, সদস্য সচিব এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল।

সাংস্কৃতিক সাব-কমিটি : আহ্বায়ক জয়ন্তী রায়, যুগ্ম-আহ্বায়ক পদ্মাবতী দেবী, সদস্য সচিব নারায়ণ সাহা মনি।

মিডিয়া সাব-কমিটি : আহ্বায়ক প্রণব সাহা, সদস্য সচিব সন্তোষ শর্মা।

মহিলা সাব-কমিটি : আহ্বায়ক মঞ্জু ধর, সদস্য সচিব স্বপ্না বিশ্বাস।

সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতিটি সাব-কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব স্ব স্ব সাব-কমিটির প্রয়োজনানুযায়ী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

বি চি ন্তা

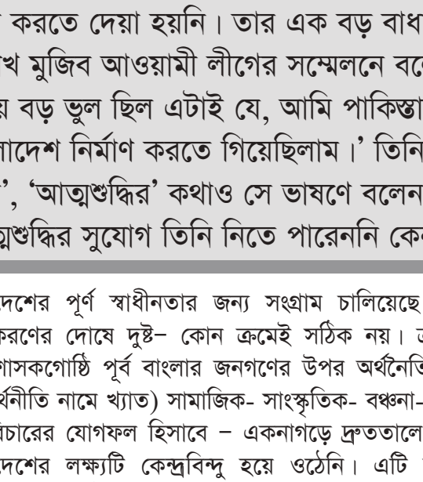

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

বাংলাদেশ- পাকিস্তান পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদানের সুবাদে ভুট্টোর ফিরতি বাংলাদেশ সফর ১০৭ জন সফর সঙ্গী নিয়ে, ইতোপূর্বে অগ্রগামী দলের আগমন, বাংলাদেশ বিরোধীদের সাথে ভুট্টোর বৈঠক- বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার গোপন পরিকল্পনা পত্র পত্রিকায় উঠে আসে। ভুট্টোর কাছে সরকার বদলের কর্মকান্ডে সাহায্য চেয়ে কমরেড আবদুল হকের পত্র- ভুট্টোর ইতিবাচক সাড়া ইত্যাদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সামান্য অংশ মাত্র।

এই সময়কালে তীব্র ঝাঁকালো সাম্প্রদায়িক প্রচারণা তুঙ্গে উঠে- তার সাথে যুক্ত হয়, কারণে- অকারণে অন্ধ ভারত বিরোধীতা যা 'হিন্দু বিদ্বেষ' 'অমুসলিম বিদ্বেষের' নামান্তর হয় সময় সময়। এ বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রচার প্রোপাগান্ডা "সম্মানজনক" অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং মজলুম শ্রমিক- কৃষকের দাবিতে ইতিহাস সৃষ্টিকারী লড়াকু নায়ক মজলুম জননেতা মৌলানা ভাসানীকে উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক জিগিরে সামিল করতে সমর্থ হয়। মৌলানার নামে প্রকাশিত 'হক কথা' পত্রিকাটি ক্রমাগতভাবে সাম্প্রদায়িক ভেদ- বিদ্বেষ এবং অন্ধ ভারত- বিদ্বেষের 'হট কেক' হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে স্বৈরাচারের 'ঝাড়ুদার' মন্ত্রী আনোয়ার জাহিদের কৌশলী ও দক্ষ সংবাদভাষ্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও ভাষ্য ভাষণ জোগাত, যার সিংহভাগ সরবরাহ করতো পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই।

এত কিছু সত্ত্বেও এহেন অশুভ পরিকল্পিত বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার- প্রচারণা- কার্যক্রম রুখে দিতে, প্রতিহত করতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শের আগুনে সমাজকে সজাগ- সতর্ক ও সচেতন করবার ব্যাপক ও ধারাবাহিক প্রচারাভিযান অপরিহার্য ছিল, এক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশব্যাপী তাদের প্রচারে নামানো যেতো এবং ক্রমশঃ প্রশিক্ষিত জনশক্তির ঘাটতি পূরণও হতে পারতো। ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা ছিল প্রধান জাতীয় কর্তব্য। যা দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষমতাসীনরা করতে পারেননি বা করতে দেয়া হয়নি। তার এক বড় বাধা ছিল প্রশাসন। ৭৪ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বলেছিলেন 'আমার জীবনের সব চেয়ে বড় ভুল ছিল এটাই যে, আমি পাকিস্তানের প্রশাসন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ নির্মাণ করতে গিয়েছিলাম।' তিনি 'আত্মজিজ্ঞাসা', 'আত্মসমালোচনা', 'আত্মশুদ্ধির' কথাও সে ভাষণে বলেন। দল- প্রশাসনে- সরকারে সে আত্মশুদ্ধির সুযোগ তিনি নিতে পারেননি কেন তাও অনুমেয়।

মধ্যবিত্তের বিকাশ : ৭২ সনের পর মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটে দ্রুত লয়ে আর এই মধ্যবিত্তই হয়ে উঠে নিয়ন্ত্রক সামাজিক শক্তি। একটি পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান দেশে সামন্ত ব্যবস্থার মধ্য থেকে রাষ্ট্রের সাহায্য ও আনুকূল্যের উপর এই মধ্যবিত্ত দ্রুত লয়ে বিকশিত ও বিত্তবান হয়ে উঠেছেন,- দুর্নীতি- স্বজনপ্রীতির উপর নির্ভর করে হয়েছে এই বিত্তবানদের বেড়ে-ওঠা ও গড়ে- ওঠা। মধ্যবিত্তের বিকাশের এই ধারাটিকে প্রভাবিত করা যেতো যদি দেশপ্রেমে তাদের উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সুসংহত শক্তিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতো। এক্ষেত্রে জাতীয় ভাবে উক্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাতে অপরাগতা মধ্যবিত্তকে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির উপর ভর করে উঠার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত করে তুলেছে। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানি আমলে ঔপনিবেশিক শাসন- শোষণ- বঞ্চনা- বৈষম্যের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠার বদলে সরকারি আনুকূল্যে, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির সহায়তায় আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ, কলাগাছ থেকে বটগাছ এবং জোড়া বটগাছ হয়ে ওঠার অসুস্থ ধারা জোরদার হয়। এই অশুভ প্রভাবটি সার্বিক জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা, বিশ্ব প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিহত এবং পাকিস্তান ও তার মিত্রদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থবহ করতে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠনের কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য সচেতন ও আত্মনিবেদিত কর্মীবাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে উক্ত জনশক্তির অভাব পূরণের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে প্রধানত জাতীয়তাবাদী শক্তি ও কিছু পরিমাণে বাম নেতৃত্ব সেক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় রেখেছে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কতিপয় ঘটনা বা লক্ষণ দেশবাসী যা প্রত্যক্ষ করেছে তাতে ভবিষ্যত সংকটের উপাদান ফুটে উঠেছে। যেমন তাজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সরকারের মধ্যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আপোষহীন যুদ্ধের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে দিলেঢালা কোন ফেডারেশনের জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন যে

মুশতাকীয় শক্তি তাদের অনুসারীদের প্রভাব স্বাধীন বাংলাদেশে উলেখযোগ্য ছিল, ছিল সেনাবাহিনী তথা প্রশাসনের মধ্যে, এছাড়া পরবর্তীতে পাকিস্তান ফেরত সেনা আমলাদের সেনাবাহিনী ও সরকারে অন্তর্ভুক্তি প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে বলশালী করে তোলে।

আরেকটি বিষয় গভীরভাবে তলিয়ে খতিয়ে দেখা হয় নি যে, ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলী থেকে পাকিস্তানকে তালাক দিয়ে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছে একটি সরলীকরণের দোষে দুষ্ট– কোন ক্রমেই সঠিক নয়। ক্রমাগত পাক শাসকগোষ্ঠি পূর্ব বাংলার জনগণের উপর অর্থনৈতিক (যা দুই অর্থনীতি নামে খ্যাত) সামাজিক- সাংস্কৃতিক- বঞ্চনা- বৈষম্য ও অবিচারের যোগফল হিসাবে – একনাগাড়ে দ্রুততালে স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ্যটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেনি। এটি তখনিই অনিবার্য হয়ে উঠে প্রাথমিক ভাবে ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীন ও পরিত্যক্ত অবস্থা, ৭০ সনে গোর্কির ছোবলে ১০ লক্ষ নর-নারী-শিশুর বেঘোরে মৃত্যুতে শাসকগোষ্ঠির অবজ্ঞা-অনাদর-অবহেলা সর্বোপরি ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকহানাদারদের পরিকল্পিত বর্বরতম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন সার্বভৌম বাংলাদেশের উত্থানের সর্বজনীন চাহিদা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। আরও একটি বিষয় বিবেচনা থেকে এড়িয়ে যায় যে, ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশের বিভাজনের পক্ষে যে, বিপুল পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম জনগণ উদ্দীপিত ছিল তাদের চেতনার জগত থেকে সাবেকী চিন্তা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর কর্পূরের মতো উবে যাবে সে ভাবনাও সুবিবেচনা প্রসুত ছিল না।

তাইতো ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের কিছুদিনের মধ্যে 'মুসলিম বাংলা' দাবিতে জনমত গড়ে তোলার বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি হয় সমাজের মধ্য থেকেই। অথচ বাঙালিসহ আদিবাসী জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী পথরেখা নির্ণীত হয় নি, কিন্তু এই সময়ে অতিদ্রুত বেগে মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছে উলেখযোগ্যভাবে। পাশাপাশি প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি স্বাধীনতার বিরোধী পক্ষকে তেজী ও জোরদার করে। এছাড়া রাজনীতির পতনবন্ধুর পথ মাড়িয়ে আধা সামন্তবাদী পথ ধরে মধ্যবিত্তের বিকাশটাকে হয়ত প্রভাবিত করা যেতো ইতিবাচক ধারায় যদি দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে জমায়েত হওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে কার্যকর ভাবে প্রশিক্ষিত জনশক্তির অভাব ও শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব হতো। জাতীয়তাবাদের আদর্শিক আবেগজাত চেতনার সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টির কাজটিও।

স্বাধীনতা– উত্তর পরিস্থিতির মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের এবং তৎ পরবর্তীকালে যে সকল ঘটনা বা লক্ষণ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করে তাতে নিহিত ছিল ভবিষ্যত সংকটের উপাদান। যেমন তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন সরকারের মূলধারার পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন লক্ষ্যাভিমুখিনতা যেমন মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশবাসীর দেখে এসেছিল তার পাশাপাশি পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে দিলেঢালা ফেডারেশনের মুশতাকীয় ধারাটি দল, সরকার ও সেনাবাহিনীসহ প্রশাসনে উলেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তান ফেরত সেনা-আমলা বাহিনীর অংশটি সরকারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্তিতে উপরোক্ত ধারাটি জোরদার হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভীরভাবে খতিয়ে ও তলিয়ে দেখা হয় নি। সেটি হলো ভাষা আন্দোলন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সাথে পূর্ববঙ্গের বিচ্ছেদের প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে এবং তা পরবর্তী ঘটনাবলীর মাধ্যমে তড়তড় করে পূর্ণ স্বাধীনতার সিঁড়িগুলো অবলীলায় অতিক্রম করে ৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের অভাবনীয় বিজয় এবং ষাটের ঐতিহাসিক শিক্ষা আন্দোলন ও স্বৈরাচার পতনের লড়াইয়ের সাফল্যের শেষ প্রান্তে ১ দফা তথা স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্ন উঠে। এটি এক সরলীকরণের দোষে-দুষ্ট ধারনা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি পূর্ব বাংলার জনগণের উপর কলোনীর ন্যায় যে অর্থনৈতিক- সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বহুমুখী বঞ্চনা ও অবিচার চালায় যার যোগফলে এনামগাড়ে দ্রুততায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিও সঠিক বলা চলে না। পাকিস্তানের ১২০০ মাইল বিচ্ছিন্ন দুই অংশের মধ্যে বহুমাত্রিক বৈষম্য-বঞ্চনা-প্রত্যর্বতন পূর্ণ দু'টি অর্থনীতির সফল প্রচারণা পূর্ববঙ্গের জনমনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি এবং শ্রেণী নির্বিশেষে তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার ভিত্তি তৈরী করে। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অনাস্থা চরমভাবে বৃদ্ধি পায়। পাক-ভারত যুদ্ধের সময়কালে তখন পূর্ব বঙ্গের জনগণ বুঝতে পারে যে, তারা চরম নিরাপত্তাহীন এবং শাসকগোষ্ঠির দ্বারা পরিত্যক্ত।

এছাড়া ৭০ সনের গোর্কির ছোবলে ১০ লক্ষ নর-নারী-শিশুর বেঘোরে মৃত্যুবরণ ও বিপুল সম্পদহানিতে পাক শাসকগণের পূর্ব বঙ্গের বিপন্ন জনগণের প্রতি অনাদর। অবজ্ঞা ও অবহেলা যখন বিশ্ব প্রচার মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় তোলে সর্বোপরি একাত্তরের ২৫ শে মার্চের কালোরাত্রিতে ইতিহাসের নৃশংশতম পরিকল্পিত গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ পূর্ব বঙ্গের জনগনের সাথে পাক শাসক চক্রের বিচ্ছিন্নতা প্রকটতর ও ত্বরান্বিত এবং স্বাধীনে বাংলাদেশের উদ্ভবের বাস্তব সর্বজনীন চাহিদা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে।

একথা সত্য যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোদ্ধা, চিন্তক ও রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি ও বিবেচনার থেকে বাদ পড়ে যায়। তা হলো পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের মধ্যে আত্মবিকাশের স্বার্থে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভাজনের লক্ষ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা বিশাল হয়ে উঠেছিল। যা পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সেই সকল আত্মবিকাশের আবেগ-চিন্তা কার্পাসের মত উবে যাবে। এসব ভাবনাও সঠিক ছিল না- সুবিবেচনাপ্রসূত তো নয়ই। তাই তো ১৯৭২ সনের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় উৎসব শেষ হতে না হতেই স্বাধীন দেশের জনগণের একাংশের মধ্যে মুসলিম বাংলার জনমত গড়ে তোলার বাস্তব ভিত্তি তৈরী হয় সমাজের ভেতর থেকেই।

একথাটি অসত্য নয়, বাঙালিসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠিসমূহের মুক্তি সংগ্রাম সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী পথরেখা স্থির হয় নি। পাশাপাশি উলেখযোগ্য ভাবে এই সময় অতিদ্রুত মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটতে থাকে। এসময় মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল বাহিনীগুলোকে সুবিন্যস্ত ও সমন্বিত করে জাতীয় কর্তব্য পালনে কার্যকর ও পরিকল্পিতভাবে নিয়োজিত করতে পারলে উৎপাদন উন্নয়ন ও দেশ পুণর্গঠনে বিপুল জাগরণধর্মী সম্ভাবনার সৃষ্টি সম্ভব ছিল যা প্রভূত পরিমাণে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারতো মধ্যবিত্তের বিকাশকে, দেশের বাইরে ও ভিতরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের প্রশিক্ষিত জনশক্তির অভাব ও শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব হতো।

ফলে জাতীয়তাবাদের আদর্শিক চেতনায় দেশ গড়ার সামাজিক বাতাবরণের কাজটি সহজ হতো। অথচ তা হলো না। একটি পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান, আধা সামন্তকবলিত দেশে প্রধানত রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও আনুকূল্যের উপর নির্ভর করে বিকশিত হয়েছে আমাদের মধ্যবিত্ত এবং বিত্তবান হয়ে উঠেছেন দ্রুততালে। আর এই কাজে দূর্নীতি স্বজনপ্রীতি হয়েছে তাদের কাছে মই বিশেষ। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি ধারার শোষণ- শাসনবিরোধী জাতীয় সংগ্রামের ধারায় বেড়ে উঠার পরিবর্তে সরকারি আনুকূল্যে রাতারাতি ধনী হওয়ার পথে তারা পা বাড়ায়। এই বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা ও স্বাধীনতার পরে

পৃষ্ঠা ২

> এত কিছু সত্ত্বেও এহেন অশুভ পরিকল্পিত বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার- প্রচারণা- কার্যক্রম রুখে দিতে, প্রতিহত করতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শের আগুনে সমাজকে সজাগ- সতর্ক ও সচেতন করবার ব্যাপক ও ধারাবাহিক প্রচারাভিযান অপরিহার্য ছিল, এক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশব্যাপী তাদের প্রচারে নামানো যেতো এবং ক্রমশঃ প্রশিক্ষিত জনশক্তির ঘাটতি পূরণও হতে পারতো। ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা ছিল প্রধান জাতীয় কর্তব্য। যা দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষমতাসীনরা করতে পারেননি বা করতে দেয়া হয়নি। তার এক বড় বাধা ছিল প্রশাসন। ৭৪ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বলেছিলেন 'আমার জীবনের সব চেয়ে বড় ভুল ছিল এটাই যে, আমি পাকিস্তানের প্রশাসন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ নির্মাণ করতে গিয়েছিলাম।' তিনি 'আত্মজিজ্ঞাসা', 'আত্মসমালোচনা', 'আত্মশুদ্ধির' কথাও সে ভাষণে বলেন। দল- প্রশাসনে- সরকারে সে আত্মশুদ্ধির সুযোগ তিনি নিতে পারেননি কেন তাও অনুমেয়।

বি চি ন্তা

ওরা গুম হয়, ওরা খুন হয়

বিধান দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিক দু'দুটো হত্যাকাণ্ড একই উদ্দেশ্যে সংঘটিত, কিছু সময়ের আগুপিছু। একই এলাকায় তো বটেই। নৃশংস এ দুটো হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশাসনের চোখ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেও সাধারণ মানুষের মন দুঃখশোকে পাথরভারি হয়ে আছে। এ দুটো হত্যাকাণ্ড একই সমান্তরাল রেখায় সবটা মেলানো হয়তো যায় না, কিন্তু স্থানিক নামের ক্ষেত্রে অদ্ভুত এক মিল বা সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। খুলনার 'ফুলতলা' ও 'ফুলবাড়ি' নাম দুটো অবধানতাবশত গুলিয়ে যেতে বাধ্য।

সম্প্রতি এ এলাকায় দু'জন জনসেবক খুন হয়েছেন। একজন ফুলতলা উপজেলা থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরবর্তী শুক্লাস্মরণিকা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সদ্য সাবেক প্রধান শিক্ষক ফুলকুমার হালদার। অন্যজন মহানগর আওতাধীন ফুলবাড়ির কয়েক লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রান্তিক মানুষের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যসেবার মহান পেশায় নিয়োজিত চিকিৎসক ডা. গৌরাঙ্গচন্দ্র দাস। সম্প্রদায়গতভাবে দু'জনই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এলাকাবাসী এই খুনের ঘটনাকে তাই 'বিশেষ ষড়যন্ত্র' হিসেবে দেখছেন।

ঘটনার বিস্তারিত ও বিশেষণ :

ফুলকুমার হালদার বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ স্থানীয় উপজেলা কমিটির সহ-সভাপতি ও একজন উচ্চকণ্ঠ মানুষ। প্রতিবাদী ও সাহসী। আশির দশকের গোড়ায় কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত বেকারকে নিয়ে পৈতৃক জমিতে গড়ে তোলেন পটিয়াবান্দা শুক্লাস্মরণিকা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী জোগাড় করেছেন। তার আগে এক যুগ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকে চাকরি করেছেন। মাদার তেরেসা প্রতিষ্ঠিত 'মিসনারিজ অব চ্যারিটিজ'র খুলনা শাখার সঙ্গে আমৃত্যু জড়িত ছিলেন। ফুলকুমারের সহযোগিতায় ওই প্রতিষ্ঠান সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সপ্তাহান্তে বানিয়াপুকুর বাজারে একদিন ফ্রি চিকিৎসাসেবা দিত। হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছে। এছাড়াও তিনি জটিল ব্যয়বহুল রোগগ্রস্ত মানুষকে খুলনা অথবা ঢাকায় নিয়ে উলিখিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। নিরন্ন অভাবী মানুষদের মাসকাবারি চাল, ডাল, গম ও টাক-পয়সা সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিতেন।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাত ৮টার দিকে জনৈক লিটন বিশ্বাস ফুলকুমারকে 'জরুরি ও দরকারি কথা আছে' বলে ডেকে নিয়ে যায়। প্রতিদিনকার মতো ফুলকুমার ঘরে বসে টেলিভিশন দেখছিলেন। স্ত্রী জানকি হালদার এ সময়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ফুলকুমার স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করতে বলে লিটনের সঙ্গে রাস্তার দিকে এগিয়ে যান। ফুলকুমার আর ফিরে আসেননি। মোবাইল নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পর রাত এগারোটার দিকে বাড়ির কাছে একটি জংলার ওপারে শিরীষ গাছের ডালে ও গলায় দড়ি লাগানো মাটিতে বসা পুরো শরীর কাঁদা মাখানো ফুলকুমারকে আবিষ্কার করা যায়।

ফুলকুমারের সঙ্গে কী কারো পূর্ব শত্রুতা ছিল ? তিনি কী অজাতশত্রু ছিলেন? এসব প্রশ্নের উত্তর জানার আগে আমরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্রাম হিসেবে পরিচিত পটিয়াবান্দা-বানিয়াপুকুর গ্রামের বাস্তব অবস্থাটা জেনে নেব।

বাংলাদেশের অনেক সংখ্যালঘু গ্রামের মতো ঐতিহ্যবাহী পটিয়াবান্দা বানিয়াপুকুর দুটো গ্রামের নিরীহ অধিবাসীরা সাম্প্রদায়িক ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে আসছে। তাদের পূর্ব-পুরুষরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা এলাকা শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা করেছেন। ফুলকুমার হালদার ছিলেন তাদের যোগ্য উত্তরসূরি। দু'একজন বাদ দিলে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকাসহ স্কুল পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ অধিকাংশই ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুশিক্ষিত মেধাবী মানুষজন। এই কর্তৃত্ব প্রতিবেশি বা পার্শ্ববর্তী সংখ্যাগুরু গ্রামের লোকজন সন্দেহের চোখে দেখেছে। রাজনীতির বলপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের ভুল পথ বেয়ে অনেক অযোগ্যতা নিয়ে কেউ কেউ ওইসব ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে ঢুকে প্রতিনিয়ত কর্তৃত্ববাদিতার চর্চা করছেন। এখন বেসরকারি স্কুল-কলেজ মানে কাড়ি কাড়ি টাকা। নিয়মের ফাঁকগলে অনিয়মের নিয়োগ বাণিজ্য। এই কুশিক্ষিত শিক্ষকেরা অনেক সুশিক্ষিত সব্যসাচী সংগ্রামী শিক্ষককে স্কুল থেকে নীরবে চলে যেতে বাধ্য করেছে। যাবতীয় অযোগ্যতা নিয়ে নিজেই প্রধান শিক্ষক হয়ে বসেছেন।

শুক্লা স্মরণিকা বিদ্যালয় থেকে ফুলকুমার হালদার সদ্য অবসর নিয়েছিলেন। কেরানি, নাইটগার্ডসহ আরো চারজন শিক্ষক অবসরে গেছেন। অবসরে গেলেও প্রতিদিন তিনি স্কুলে যেতেন, স্কুলের ভালোমন্দ খোঁজ-খবর রাখতেন। একজন মেধাবী যোগ্য শিক্ষক তার স্কুলভিত্তিক হোক তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন। এটাই কী তার মৃত্যুর কারণ ? রাজনীতিতে ডিগবাজী খাওয়া আদর্শচ্যুত সুবিধাভোগী ওই প্রধান শিক্ষকের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও এলাকায় প্রভাব-বিস্তারের ক্ষমতার হিসাব-নিকাশও নিহিত আছে এই হত্যাকাণ্ডে।

ফুলকুমার হালদারের হত্যাকাণ্ডে যথানিয়মে থানা-পুলিশ বরাবরে আসামীদের নামোলেখে লিখিত এজাহারনামায় [স্বাঃ ১৭১০(৩)/১/১৯.০৯.১৩ ফুলতলা থানা, খুলনা] আইনগত সাহায্য চাওয়া হয়েছে। পথসভা, প্রতিবাদ সভা মানববন্ধন পালন করেছেন স্থানীয় জনগণ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ। স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রতিবাদ সভায় হাজির থেকেছেন। দুর্ভাগ্য, এই চিহ্নিত আসামীরা প্রকাশ্যে এলাকায় ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের খুঁজে পাচ্ছে না। নষ্ট রাজনীতি ও ক্ষমতার প্রসারিত হাত সবকিছু ম্যানেজ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। উল্টে আসামীরা বাদীকে হুমকিধামকি দিচ্ছে।

অন্যদিকে ডা. গৌরাঙ্গচন্দ্র দাসকে খুন করা হয়েছে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মৈত্রী ক্লিনিকের নিজস্ব বসার কামরায়। খুনি আশ্রিত ক্লিনিক ম্যানেজার রাসেল। ডা. গৌরাঙ্গ রাসেলের অন্নদাতা। প্রতিবেশি রাসেলের মা মৈত্রী ক্লিনিকের আয়া। লেখাপড়ার খরচ জুগিয়ে ডা. গৌরাঙ্গ অভাবী রাসেলকে 'মানুষ' করতে চেয়েছিলেন। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তারই প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিকে চাকরির ব্যবস্থা করেন। ক্লিনিকে কর্তব্যরত নার্সদের প্রায়ই উত্যক্ত করতো রাসেল। বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে চাকরি থেকে প্রত্যাহারের হুমকি দেন ডা. গৌরাঙ্গ। রাসেল তারই প্রতিশোধ নিয়েছে। দায়ের কোপে একটি হাত ও গলা থেকে মাথা নব্বইভাগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এসব ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে। অসহায়ের মতো দূরে দাঁড়িয়ে নার্সরা ঘটনাটি দেখেছে। মৃত্যু ও কোপের ভয়ে কেউ বাধা দিতে যায়নি। নির্বিঘ্নে বীরোচিত ভঙ্গি নিয়ে নিজের অন্নদাতার মৃত্যু নিশ্চিত জেনে রাসেল নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। শুধুমাত্র এই ঘটনাটুকুই কী ডা. গৌরাঙ্গের মৃত্যুর কারণ ? নাকি পেশাগত সুনামের ঈর্ষার পথ ধরে একই পেশার অন্য ক্লিনিকের ডাক্তার-মালিকেরা রাসেলকে এই ঘৃণ্য কাজে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করে থাকবে ?

মোদ্দাকথা, উলিখিত দুটো হত্যাকাণ্ড নিয়ে পুলিশ প্রশাসন দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সন্দেহভাজন আসামীদের গ্রেফতার করতে পারেনি।

পুলিশ এতোকিছু পারে, এ কাজটি পারছে না কেন? আমরা মনে করি, এজাহারভুক্ত, সন্দেহভাজন আসামীদের গ্রেফতার করলে আসল সত্য বেরিয়ে আসবে। নইলে সত্য আড়াল হলে জনশত্রুরাই শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

লেখক : সাংবাদিক, গবেষক

সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ : নির্বাচনকালীন সহিংসতা ও অন্যান্য অনুসঙ্গ

প্রিয়া সাহা

হাজার হাজার বছর ধরে বসবাসকারী এই ভূখণ্ডের আদি অধিবাসী এবং অবিসংবাদিতভাবে একটি উন্নত ও আধুনিক সভ্যতার সৃজন ও বিবর্তনের কারিগর এক বিশাল জনগোষ্ঠী বর্তমানে অস্তিত্বের সংকটে উপনীত হয়েছে। এই ভূখণ্ডের সনাতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই জনগোষ্ঠী কতিপয় রাজনীতিবিদদের ধর্মীয়, আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতালিপ্সার কূটচালপ্রসূত ঐতিহাসিক ভুল সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে আজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। ধর্মের-ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় বিভাজনের ধারণা ও তার সফল প্রয়োগ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদের বলি বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীর অচিরেই বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কতিপয় বিদগ্ধজন।

ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন অবসানের প্রাক্কালে বিশ শতকের চলিশের দশকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণার উন্মেষ ঘটান। এটি ছিল ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ভারতকে রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত করার নির্ণায়ক ও আদর্শশ্রয়ী একটি রাজনৈতিক মতবাদ। দ্বিজাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক অভিঘাতে ১৯৪৭ সালে জন্ম নেয়া পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বিশাল একটি জনগোষ্ঠী রাতারাতি অবাঞ্ছিত হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় বিধানে অবাঞ্ছিত এই জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসে হিংসা, বিদ্বেষ আর নির্মূলীকরণের খড়গ। শুরু হয় দেশান্তর প্রক্রিয়া। যারা চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি আঁকড়ে পড়ে ছিলেন তাদের উৎখাত করার প্রক্রিয়ায় একের পর সংঘটিত হতে থাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অত্যাচার-নির্যাতন– সেই সময়ের রাষ্ট্র নায়কদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও পরোক্ষ নিষ্ক্রিয়তায়। রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে তাদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। একের পর এক নিপীড়নের শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষ দেশান্তরকে তাদের নিয়তি হিসেবে মেনে নেন। ব্যাপক এই দেশত্যাগের ফলশ্রুতিতে ২৩ বছরে (১৯৪৭-১৯৭০) পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সংখ্যা ৫০% শতাংশ হ্রাস পায়।

১৯৭১ সালে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলনীতি নিয়ে জন্মলাভ করা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর দীর্ঘদিনের চলমান নির্মূলীকরণের অবসান ঘটবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু সেই আশা অচিরেই দুরাশায় পরিণত হয় পাকিস্তান আমলে জন্ম নেওয়া শত্রুসম্পত্তি নামক কালো আইন অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে বহাল রাখার মধ্য দিয়ে। ক্রমান্বয়ে ৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন সামরিক শাসকদের হাতে একের পর এক কলুষিত হতে থাকে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কায়েমের মধ্য দিয়ে রাতারাতি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয় এদেশে বাসবাসকারী অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা। জেনারেল এরশাদ সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ লুটে নেওয়ার তাগিদে এ কাজটি করেছিলেন। একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ায় ও অন্য ধর্মসমূহকে সেই মর্যাদা না দেওয়ায়, রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি প্রাপ্ত ধর্মের তুলনায় বাকি ধর্মগুলোর মর্যাদা আপনা আপনি খাটো হয়ে যায়। ফলে এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা পুনরায় হুমকির মুখে পড়ে।

অন্যদিকে ৭৫ পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে কয়েক লক্ষ সেটেলার বসতি স্থাপন করায় হুমকির মুখে পড়ে পাহাড়ের আদিবাসীরা। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ভঙ্গ করে সেখানে বাঙালি সেটেলারদের এই পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে বাঙালিকরণ ও ইসলামীকরণের কাজ। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান লাখ লাখ দরিদ্র বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠানোর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেন। এ সময় সামরিক শাসনের অধীনে যে পুনর্বাসন শুরু হয়েছিল তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পাহাড়িদের নিজস্ব জমি থেকে উচ্ছেদ করে বাইরের জেলা থেকে লোক এনে পাহাড়িদের জাতিগত অস্তিত্বকে অবলুপ্ত করা। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বসতি স্থাপনের ধারা আরও তীব্রতর হয়। প্রথম দিকে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমতল ভূমি থেকে তিন ধাপে বাঙালিদের এ অঞ্চলে আনা হয়। ১৯৭৯-৮০ সালে প্রায় ১,০০,০০০ সেটেলারকে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়। এরপর ১৯৮১ সালে প্রায় ১,০০,০০০ এবং ১৯৮২-৮৩ তে প্রায় ২,০০,০০০-এর বেশি বাঙালি মুসলমানকে পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করানো হয়। বাঙালি মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনের এই ধারা অব্যাহত থাকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শতাব্দীব্যাপি আদিবাসীদের জনসংখ্যার পরিবর্তনে দেখা যায়, ১৮৭২ সালে ৯৮ ভাগ পাহাড়ি ও মাত্র ২ ভাগ বাঙালি ছিল। ১৯০১ সালে তা বেড়ে ৭ ভাগ, ১৯৫১ ও ১৯৫৬ সালে ৯ ভাগ, ১৯৮১ সালে ৩৯ এবং ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮ ভাগ বাঙালি। এ বিপুল পরিমাণে বাঙালি সেটেলারদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আদিবাসীরা তাদের নিজ আবাস ভূমিতেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। একের পর এক ঘটতে থাকে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার কর্তৃক পাহাড়িদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও উঠে গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক উচ্ছেদ, ধর্মীয় নিপীড়নের মতো অমানবিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ। বিপুল সংখ্যক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়ে শরণার্থী জীবন বেছে নিতে বাধ্য হন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নির্যাতন, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড ও গণহত্যার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড

* ১৯৭৭ সালের প্রথমদিকে বাংলাদেশ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা, গুইমারা, মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ির কয়েকটি গ্রামে হামলা চালিয়ে ৭৩ জন আদিবাসী নারী-পুরুষকে হত্যা এবং তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়।
* ১৯৭৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর কুকিছড়া গ্রামের নাথু চন্দ্র চাকমার পরিবারের ১২জনকে হত্যা এবং শান্তি লাল চাকমা, নাথু চন্দ্র চাকমা ও শুক্রমনি চাকমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।
* ১৯৭৮-১৯৭৯ সময়ে উত্তর রুমায় দুমদুম্যা মৌজার প্রায় ৫০টি গ্রামে হামলা চালানো হয় এবং এর মধ্যে ২২টি গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। ১৯৭৯ সালের ৯ জানুয়ারি সুবলং উপত্যকার প্রত্যেক গ্রামে হামলা চালায়।
* ১৯৭৯ সালের ৫ মার্চ গরগজ্যাছড়ি গ্রাম থেকে সমীরণ তালুকদার ও আলোময় চাকমা নামে দুই ছাত্র এবং হল্যা নামে এক কৃষককে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়।
* ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল কাউখালী

পৃষ্ঠা ৬

ফিরে দেখা

জাতীয় ঐকমত্যের ৭ দফা দাবি

১. ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা

(ক) জাতীয় সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষে যুক্ত নির্বাচনের (সার্বজনীন ভোটের) ভিত্তিতে ২০% হারে (৭০-র জনসংখ্যা অনুসারে) ৬০টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সকল সংস্থায়ও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(খ) সাংবিধানিক পদসহ প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বস্তরে, পররাষ্ট্র, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ সরকারি চাকরির সকল স্তরে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ন্যূনতম ২০% পদায়ন সুনিশ্চিত করতে হবে।
(গ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ নিশ্চিত করতে হবে এবং এ লক্ষে দেশের সব রাজনৈতিক দলের তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিটি সাংগঠনিক কমিটির নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অন্যূন ২০% হারে সংখ্যালঘু-আদিবাসীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

২. সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ

(ক) রাষ্ট্রীয় অন্যতম মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কীয় সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক ২ক অনুচ্ছেদের বিলোপ করে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌল আদলে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
(খ) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকারের ও পরিচয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে।
(গ) ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক রক্ষাকবচ (Constitutional Safeguard) সম্বলিত অনুচ্ছেদ সংবিধানে সংযোজন করতে হবে।

৩. সম-অধিকার ও সমমর্যাদা

(ক) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও সমতলের আদিবাসীদের কল্যাণে ও উন্নয়নে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।
(খ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কল্যাণে জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে বার্ষিক বরাদ্দ প্রদান করে বিদ্যমান কল্যাণ ট্রাস্টসমূহকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করতে হবে এবং অনুরূপভাবে আদিবাসীদের জন্যও পৃথক ফাউন্ডেশন গঠন করতে হবে।
(গ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে।
(ঘ) সংসদ অধিবেশন, মন্ত্রীপরিষদের শপথ গ্রহণসহ রাষ্ট্রীয় সকল কর্মসূচি শুরুর পূর্বে সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।
(ঙ) '৪৭ থেকে এ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে দেশের সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমানহারে হ্রাসের কারণ নির্ণয়নে ও তা রোধে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্তে সংসদীয় কমিশন গঠন করতে হবে।
(চ) আদিবাসী ককাসের অনুরূপ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুবিষয়ক সংসদীয় ককাস গঠনে উদ্যোগ নিতে হবে।
(ছ) সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন

(ক) পার্বত্য শান্তিচুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নসহ এ চুক্তির আলোকে পার্বত্য ভূমি কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে অনতিবিলম্বে তা কার্যকর করতে হবে।
(খ) সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যার নিশ্চিত সমাধানের নিমিত্তে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করে তাদের ভূমির অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।
(গ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, দানের ঘোষণা সম্বলিত নিবন্ধন আইন ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
(ঘ) দেবোত্তর সম্পত্তি আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে;
(ঙ) অধিকতর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হরিজন, দলিত, ঋষি সম্প্রদায় এবং অবহেলিত চা-শ্রমিকদের পেশা ও ভূমির অধিকারসহ তথা সামগ্রিক কল্যাণে সকল প্রকারের সামাজিক বৈষম্য নিরসনে বিশেষ আইন প্রণয়নসহ নানাবিধ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে শিক্ষিত হরিজন, দলিত, ঋষি জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি কোটার মাধ্যমে নিয়োগের নিমিত্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন

(ক) জাতীয় স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড প্রণীত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকে দেশের সকল ধর্ম ও জাতিসত্তার সম-মর্যাদার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।
(খ) দেশের সকল বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিস্টানসহ অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সকল পর্যায়ের ধর্মশিক্ষকের ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্যের অবসান করতে হবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, অনুদানে ও পরিচালনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষায়তন চালু করতে হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মশিক্ষার বিদ্যমান শিক্ষায়তনগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে।

৬. দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ

(ক) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর হামলার ক্ষেত্রে দায়মুক্তির সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে হবে এবং তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে।
(খ) সংখ্যালঘু সুরক্ষাজনিত আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত দ্রুত বিচার আইন ও সন্ত্রাস দমন আইনে শাস্তির বিধান বাড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুততম সময়ে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।
(গ) ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনাবলীর বিষয়ে গঠিত সাহাবুদ্দিন কমিশন রিপোর্টের সুপারিশমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
(ঘ) সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসরোধে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ

যে কোন ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, বর্ণবৈষম্য ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধে রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ : নির্বাচনকালীন সহিংসতা ও অন্যান্য অনুসঙ্গ

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

হত্যাকাণ্ডের নায়ক ক্যাপ্টেন আবুল কালাম কানুনগোপাড়া গ্রামে হামলা চালিয়ে সিন্ধু কুমার চাকমা, অরুণ কান্তি চাকমা ও অনাবিল চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে মৃতদেহগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।
* ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তৎকালীন প্রভাবশালী নেতা কল্পরঞ্জন চাকমাসহ ৭০ জন পাহাড়িকে গ্রেফতার করে নির্যাতনের পর ছেড়ে দেয়া হয়।

গণহত্যা

Amnesty International-এর বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত রিপোর্টে বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী ও বাঙালি সেটেলারদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐ সময়ে পরিচালিত নিম্নলিখিত গণহত্যার অভিযোগ করা হয় :
* কাউখালী গণহত্যা (২৫ মার্চ ১৯৮০) ঃ বাঙালি সেটেলাররা কাউখালী থানা সদর এবং এর পার্শ্ববর্তী পোয়াপাড়া, বেতঝড়ি, মিতিঙ্গাছড়ি, হাতিমারা, কাশখালী, ছোট ডলু, রাঙ্গীপাড়া, কচুখালী ইত্যাদি আদিবাসী পাড়ায় হামলা চালিয়ে বহু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এ হামলায় তিন শতাধিক মানুষ নিহত হয়।
* বানরাইবারি, বেলতলা ও বেলছড়ি গণহত্যা (২৬ জুন ১৯৮১) : কাউখালী হত্যাকাণ্ডের এক বছর পরেই ১৯৮১ সালের ২৬ শে জুন বানরাইবারি, বেলতলী এবং বেলছড়িতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ সময় ক্ষমতার সহায়তা ও নিরাপত্তায় বাঙালি সেটেলাররা বানরাইবারি, বেলতলী ও বেলছড়িতে আক্রমণ করে। এতে প্রায় ৫০০ আদিবাসী পুরুষ, নারী ও কিছু শিশু নিহত হয় এবং সেটেলাররা তাদের গ্রাম, জমি ও খামার দখল করে নেয়। এক হাজারের অধিক পাহাড়ি জনগণ নিকটবর্তী বনে পালিয়ে যায় এবং ৫,০০০ এর মতো শরণার্থী হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যায়।
* তেলাকাং, আশালং, গুরানগাপাড়া, এবলাছড়ি ও বায়নালা গণহত্যা (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১) : বাঙালি সেটেলাররা ক্ষমতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে মিলিত ও পরিকল্পিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ফেনী উপত্যকার ৩৫টি পাহাড়ি অধ্যুষিত গ্রামে আক্রমণ চালায়। আক্রান্ত এই গ্রামগুলোর মাঝে অন্যতম হলো তেলাফাং, আশালাং, গুরানগাপাড়া, তাবালছড়ি, বায়নালা ইত্যাদি। এইসব গ্রামে তারা একত্রে লুন্ঠন করে, হাজার হাজার গ্রামবাসীকে হত্যা করে যার মাঝে ছিল পুরুষ, নারী, শিশু এবং গ্রামগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়। যেসব আদিবাসী বেঁচে ছিলো তারা কিছু পালিয়ে যায় ত্রিপুরা রাজ্যে এবং কিছু নিকটবর্তী বনে আশ্রয় নেয়। এ সময় অনেক পাহাড়ি জনগণ ক্ষুধা ও রোগে মৃত্যুবরণ করে।
* গোলাকপতিমাছড়া, তারাবানছড়ি গণহত্যা (জুন-আগস্ট ১৯৮৩) : ১৯৮৩ সালের ২৬ শে জুন, ১১, ২৬, ২৭ জুলাই এবং ৯, ১০, ১১ই আগস্ট ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ এবং বাঙালি সেটেলাররা মিলিতভাবে গোলাকপতিমাছড়া, মাইছছড়া, তারাবানছড়ি, লোগাং, তারাবানইয়া, মারামাছইছড়া, জেজমাছইছড়া ইত্যাদি গ্রামের প্রায় শতাধিক ঘর বাড়িতে লুন্ঠন করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এসময় তারা ৮০০জনকে হত্যা করে। এদের মাঝে অধিকাংশই ছিল শিশু, বৃদ্ধ ও নারী। এই গ্রামগুলো থেকে পাহাড়িদের সরিয়ে সরকার সেখানে সেটেলারদের বসতি স্থাপন করায়।

১৯৯০ সালের আগে ও নব্বই দশকের প্রথম দিকে ভারতের বাবরি মসজিদের ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হয়েক দফায় সাম্প্রদায়িক আঘাত আসে। তৎকালীন সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হামলা, অত্যাচার ও নির্যাতনে কয়েক লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষ রাতের আঁধারে বাড়িঘর অন্যত্র আশ্রয় নেয় এর তাদের উলেখযোগ্য একটি অংশ দেশত্যাগ করে যার সংখ্যা কমপক্ষে আড়াই লক্ষ।

বাবরি মসজিদের ইস্যুতে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের পর সারা দেশে বড় আকারে সাম্প্রদায়িক তান্ডব শুরু হয়। ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫ জন হিন্দু নারী ধর্মাবলম্বী খুন হয়, ২৬০০ উপর নারী ধর্ষিতা হয়, ১০ হাজার মানুষ আহত হয়, ২ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়, ৩৬০০ অধিক মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, ৪০ হাজার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া ও দখল করা হয় এবং দশ হাজারের উপর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এটি শুধু ১০ দিনের চিত্র। পরবর্তীতেও এই হামলা বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। ঢাকা শহরে বড় আকারে হামলা হয় ৬ ডিসেম্বর ও ৭ ডিসেম্বর। তখন একটি প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকায় খবরে বলা হয়; 'বাবরি মসজিদ ঘটনায় ঢাকার হিন্দুদের মিষ্টি বিতরণ!' পরের দিন ভুল সংবাদের জন্য তারা ক্ষমা চায় কিন্তু যা হওয়ার এবং যে উদ্দেশ্যে এই সংবাদ করা হয়েছিল তা ঐ রাতেই সফল হয়। রাতের মধ্যে সকল হিন্দু পলীগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ভুল সংবাদের জন্য উক্ত পত্রিকার কোন বিচার কিংবা সরকার থেকে কোন মামলা কোনটাই হয়নি। বাংলাদেশে মিরসরাই, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, ভোলা, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বড় হামলার ঘটনা ঘটে। তৎকালীন সরকার প্রধান ভারতের বাবরি মসজিদ পুনরায় তৈরি করার আহবান জানালেও নিজ রাষ্ট্রের মানুষগুলোর অত্যাচারের কথা ও নিজের প্রশাসনের ব্যর্থতার বিষয়ে নির্বিকার থাকেন। তার এই নির্লিপ্ততার কারণে পরবর্তীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হামলার তীব্রতা অব্যাহত থাকে। পাহাড়েও বাঙালি সেটেলাররাও হামলা শুরু করে। সেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী না থাকলেও তারা বৌদ্ধদের উপর হামলা করে। সাম্প্রদায়িক হামলার গুজব রটিয়ে ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে পাহাড়ে বাঙালি মুসলিমদের হামলায় ৬০০ আদিবাসী নিহত হয়, ৪৫,০০০ বৌদ্ধ আদিবাসী পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে ভারতের রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়।

১৯৯৬-২০০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল ছিল। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর তাদের উপর নেমে আসে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। বিভিন্ন সংস্থার সরেজমিন তদন্ত ও পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ৮ম জাতীয় সংসদ ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনার ধারাবাহিকতায় ১ অক্টোবর ২০০১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে কমপক্ষে ৩৬২৫টি হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ, দৈহিক নির্যাতন, সম্পদের ক্ষতি ও গুরুতর জখমের ঘটনা ঘটে। পরবর্তী ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়ায় কমপক্ষে ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার)। এসব ঘটনার মধ্যে সংখ্যালঘুরাই ছিল অন্যতম টার্গেট। উক্ত নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের নেতা-কর্মী কর্তৃক সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ, শারীরিক হামলার মাধ্যমে জখম, হত্যা, ধর্ষণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তর ও বিয়ে, জায়গা-জমি দখল, মিথ্যা মামলায় জড়ানো ইত্যাদি এমন কোনো অমানবিক ও পাশবিক নির্যাতন নেই যা তখন সংখ্যালঘুদের উপর পরিচালনা করা হয়নি। এ সময় লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু দেশত্যাগে বাধ্য হয়। সংখ্যালঘুদের সেই দেশত্যাগ সম্পর্ক তৎকালীন সরকারের একজন দায়িত্বশীল শীর্ষস্থানীয় নেতার মন্তব্য ছিল–"কেউ যদি তাদের কৃতকর্মের দায়ে ভয় পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায় তাতে সরকারের কী করার থাকতে পারে!"

উক্ত নির্বাচনের পূর্ব থেকেই সংখ্যালঘুদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা শুরু হয়। নির্বাচনের ফলাফল

পৃষ্ঠা ২

নওগাঁয় আখড়াবাড়িতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নওগাঁ পৌর কমিটির ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি ছবি : পরিষদ বার্তা

সরকার দেশে সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে

–সাধন মজুমদার এমপি

॥ নওগাঁ থেকে বিশ্বজিৎ সরকার ॥

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ধর্ম মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি বলেছেন, ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। সরকার সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখেছেন।

তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত বর্তমান সরকারের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা সমুন্নত রাখতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

গত ১০ মার্চ দুপুরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নওগাঁ পৌর কমিটির এই প্রথম ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন। স্থানীয় আখড়াবাড়িতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পৌর কমিটির আহ্বায়ক অনিল কুমার দাস সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সাবেক এমপি শাহিন মনোয়ারা হক, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদর বগুড়া জেলা কমিটির সভাপতি ডা. এন সি বাড়ৈ, সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন কুমার সিংহ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শ্রীমতি ববিতা বর্মন ও এ্যাডভোকেট সুকমল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, চিত্তরঞ্জন সাহা, অধ্যাপক প্রণব রঞ্জন বসাক, এ্যাডভোকেট মনোজ কুমার, প্রদীপ কুমার কুন্ডু, শ্রীশ্রী রাধা-গোবিন্দ জিউ ঠাকুর বাড়ির সাধারণ সম্পাদক অসিত কুমার সাহা নৃপেন, নিতীশ কুমার বিশ্বাস, রাম চন্দ্র সরকার প্রমুখ। পরে রাম চন্দ্র সরকারকে সভাপতি ও সুশীল সরকার বাদলকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নওগাঁ পৌর কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনের আগে শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় পৌর এলাকার সহস্রাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে।

চট্টগ্রামে ঐক্য পরিষদ মহানগর ও দক্ষিণ জেলার সম্মেলন

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক চিন্তাচেতনায় প্রচুর প্রতারণা ঢুকে গেছে, এমন মন্তব্য করে সুলতানা কামাল বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালিত হবে–এটাই প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী যারা ছিল, তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যেন দেশ চলছে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, বিএনপি, জামায়াত এবং আওয়ামী লীগের একটি অংশ সংখ্যালঘুদের ওপর এখনো হামলা-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। যে সব সাংসদ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করেছেন, তাঁদের আগামি নির্বাচনে প্রার্থী না করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানান তিনি। দাশগুপ্ত বলেন, তারা যদি আবার প্রার্থী হন, তাহলে ভোট বর্জন করা ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর কোনো পথ থাকবে না।

সম্মেলনের শেষ পর্বে মহানগর ও দক্ষিণ জেলা কমিটি গঠিত হয়। চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন প্রকৌশলী পরিমল চৌধুরী ও এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ।

সহ-সভাপতিগণ হচ্ছেন অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু, জন সমাদ্দার, দীপঙ্কর চৌধুরী কাজল, বাবুল দত্ত, দুলাল চৌধুরী, অধ্যক্ষ বিজয়লক্ষী দেবী ও অরবিন্দ পাল অরুণ। যুগ্ম-সম্পাদক হলেন মতিলাল দেওয়ানজি, রুমা কান্তি সিংহ, মিঠুন বড়ুয়া, সুমন কান্তি দে, ডা. বিধান মিত্র ও সুকান্ত দত্ত। সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত ধর, থিওডোর হাওলাদার ও দেবাশীষ নাহা। অর্থ-সম্পাদক সুভাষ দাশ।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে রণজিত কুমার চৌধুরী ও তাপস হোড়।

সহ-সভাপতিগণ হচ্ছেন, প্রদীপ কুমার চৌধুরী, ডা. দিলীপ ভট্টাচার্য, অধর লাল চক্রবর্তী, এ্যাড. তুষার সিংহ হাজারী, এ্যাড. হরিপদ চক্রবর্তী, শ্রীনিবাস দাস সাগর ও এ্যাড. অনুপম বিশ্বাস। সাংগঠনিক সম্পাদক সাগর মিত্র ও তাপস কুমার দে। অর্থ-সম্পাদক বিমল মিত্র।

বেলকুচিতে দুটি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর

॥ সিরাজগঞ্জ থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে দুটি মন্দিরে কালী প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। গত ২৭ মার্চ গভীর রাতে উপজেলার ভাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নে ক্ষিদ্র জোকনালা গ্রামের বারোয়ারী কালী মন্দির ও কালীপদ সরকারের পারিবারিক মন্দিরে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পরদিন দুপুরে বেলকুচি থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাজ্জাদ হোসেনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

বেলকুচি থানার এসআই নাজমুল হোসেন জানান, রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা কালী মন্দিরে ঢুকে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এর মধ্যে বারোয়ারী কালী মন্দিরে কালীর মাথা ভেঙ্গে ফেলে ও পারিবারিক মন্দিরের কালী প্রতিমা ও সরস্বতী প্রতিমা ভাংচুর করেছে। সকালে স্থানীয়রা মাথা ভাঙ্গা দেখে পুলিশকে খবর দেয়। স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ সরকার এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বৈদ্যনাথ রায় বলেন, প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা উচিত।

পরিষদ বার্তার ই-মেইলে সংবাদ পাঠানো প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা parishadbarta@gmail.com-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবর বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

সংবাদ সম্মেলন
নাগরিক প্রতিনিধি দল

সংবাদ সম্মেলনে নাগরিক প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ ছবি : পরিষদ বার্তা

রাখাইনরা বিলুপ্ত হলে এদেশের একটি সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

সর্বশেষে সংবাদ সম্মেলনে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ জানানো হয়- (১) রাখাইনসহ দেশের সমতল অঞ্চলের সকল আদিবাসীদের বেহাত হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে একটি পৃথক ভূমি কমিশন করা এবং সেই সাথে রাখাইনদের ভূমি বেদখল রোধকল্পে জেলা পর্যায়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা। (২) রাখাইনদের ভূমি বেদখল রোধকল্পে ১৯৫০ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৭ ধারা যথাযথভাবে কার্যকর করা। (৩) বেদখলকৃত বৌদ্ধ বিহার, শ্মশান ও রিজার্ভ পুকুরসহ ও অর্পিত শত্রু সম্পত্তির নামে দখলকৃত জমি মুক্ত করে রাখাইন কর্তৃপক্ষের নিকট ফিরিয়ে দেয়া এবং অবৈধদখলদারীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করা। (৪) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও'র ১০৭ নং কনভেনশন অনুসারে রাখাইন ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ভূমির উপর ব্যক্তিগত ও প্রথাগত ভূমি অধিকার সুনিশ্চিত করা। (৫) বিকৃত করা রাখাইন পাড়ার নাম রাখাইনদের স্ব স্ব ঐতিহ্যগত নামে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা এবং রাখাইনদের ঐতিহাসিক স্থানসমূহসহ নিজস্ব সংরক্ষিত এলাকা কোনভাবেই অধিগ্রহণ না করা। বিশেষ করে ছ'আনী পাড়া গ্রাম লাগোয়া বর্তমান পায়রা পোর্টের চলমান কর্মযজ্ঞের গ্রাস থেকে এই শত বছরের পুরনো রাখাইন গ্রামটি রক্ষা করা। (৬) রাখাইন জনগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যা নিরসনকল্পে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রাখাইন জনগোষ্ঠীর সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভার উদ্যোগ গ্রহণ করা। (৭) রাখাইনদের জীবন ও সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা এবং এই অঞ্চল থেকে যেন রাখাইন মানুষেরা চিরতরে হারিয়ে না যান তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৮) বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে (পটুয়াখালী, বরগুণা) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো হল, সড়ক, সেতু বা বৃহৎ স্থাপনা বা কুয়াকাটায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম ভাষাসৈনিক উস্যুয়ের নামে করা।

বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা ও ঐক্যন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে নাগরিক প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, আইইডি'র নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান, দৈনিক সমকালের প্রতিবেদক রাজীব নূর, গবেষক ও প্রাণবৈচিত্র্য কর্মী পাভেল পার্থ, দৈনিক ভোরের কাগজের প্রতিবেদক তানভীর আহমেদ, নিউ এইজের প্রতিবেদক ইমরান হোসেন ইমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহ সভাপতি সোনা রাণী চাকমা, মানবাধিকার কর্মী রওশন মাসুদা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক দীপায়ন খীসা, ফিল্ম মেকার লতা আহমেদ প্রমুখ।

পরিষদ বার্তা মার্চ ২০১৭

২০১৬ সালে ৫৮ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

২০১৬ সালে সারাদেশে ৫৮ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী ও কন্যাশিশু শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সারাবছরে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে ৫৩টি। এরমধ্যে ২৮টি পার্বত্য চট্টগ্রামে, বাকি ২৫টি সমতলে। এর মধ্যে ছয়জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী ও শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ১৭ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

ডেইলি স্টার ভবনের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে 'সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং বাংলাদেশের আদিবাসী নারী ও কন্যা শিশুদের বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। মানবাধিকার সংগঠন 'কাপেং ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক' যৌথভাবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, আমাদের জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল এই দেশ হবে একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত দেশের সরকার অনেকগুলো আন্তর্জাতিক আইনে অনুস্বাক্ষর ও সহমত পোষণ করেছে। নীতিগতভাবে সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার প্রতিকারের জন্য অনেক কিছু কাজ করছে কিন্তু বাস্তবায়ন পর্যায়ে কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, দেশের সাধারণ জনগণের সাথে পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সবাই সাড়া দিয়েছিল।

সংসদ সদস্য শিরীন আখতার হতাশা প্রকাশ করে বলেন, সরকার অনেক ভালো ভালো আইন পাস করলেও সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে সঠিক ফলাফল আমরা পাচ্ছি না। যেকোনো ধরনের সহিংসতার ঘটনার বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যাচ্ছে। এখন যদি কোনো একটি ছোট ঘটনায় অনেক সময় লাগে তাহলে কিভাবে হবে? তাই এই দীর্ঘসূত্রতা অবশ্যই কমাতে হবে এবং সরকারিভাবে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া তিনি বলেন, আমাদের মনোজগতের পরিবর্তনও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে খুব জরুরি একটি বিষয়।

উইমেন সাপোর্ট ও ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের ডেপুটি কমিশনার ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, আমি নিজে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একজন সদস্য হয়ে দেখেছি নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা যেন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যা খুবই দুঃখজনক। আমি নিজে ঢাকা মেট্রোপলিটন-এর ৪৯টি থানার ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের দায়িত্বে আছি। প্রতিদিনই এখানে নারীরা সহিংসতার শিকার হয়ে আসছেন। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আমাদের আন্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু পুলিশ একা এই কাজে সফল হবে না। এখানে সরকারের সব সংস্থাকে মিলিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে যতগুলো আইন আছে তা মনে হয় পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, সবকিছু মিলিয়ে আমরা ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করতে পারছি না।

অধ্যাপক ডা. সাদেকা হালিম বলেন, এ দেশে নারীদের সহিংসতার ঘটনার কোনো সিস্টেমেটিক তথ্য নেই। তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এই ধরনের একটি ডেটাবেজ তৈরির জন্য আহ্বান জানান এবং দেশের সকল নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকারের কাছে দাবি জানান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাখী দাস পুরকায়স্থ, মহিলা অধিদপ্তরের হালিমা বেগম। আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সদস্য সুলেখা ম্রং-এর সভাপতিত্বে এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী ফাল্গুনী ত্রিপুরা।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পলব চাকমা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাবেক তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী, আদিবাসী নেতৃবৃন্দ। এছাড়া মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অলিভিয়া হেম্ব্রম, সন্তোষিত চাকমা বকুল, নমিতা চাকমা, গৌরাঙ্গ পাত্র, সোহেল হাজং প্রমুখ।

বরগুনা-পটুয়াখালী রাখাইন জনপদ পরিদর্শন শেষে নাগরিক প্রতিনিধি দলের সংবাদ সম্মেলন

রাখাইনরা বিলুপ্ত হলে এদেশের একটি সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

২৯ মার্চ নাগরিক প্রতিনিধি দলের উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বরগুনা-পটুয়াখালী রাখাইন জনপদ সরেজমিন পরিদর্শণোত্তর নাগরিক প্রতিনিধি দলের এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও নাগরিক প্রতিনিধিদলের সদস্য রোবায়েত ফেরদৌস এর সঞ্চালনা ও ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক ও কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ, এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, কাপেং ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক দীপায়ন খীসা, এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনে বরগুনা পটুয়াখালির রাখাইন জনপদ সরেজমিন পরিদর্শনোত্তর প্রতিবেদন পাঠ করেন নাগরিক প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ও আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, রাখাইনরা সভ্যতার একটি অংশ। যদি এদেশ থেকে রাখাইনরা বিলুপ্তি হয়ে যায় তবে এদেশের একটি সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে। তিনি রাখাইনদের বিলুপ্তির প্রসঙ্গে বলেন, মূলধারার জনগোষ্ঠী যে হারে বেড়েছে রাখাইনরা সে হারে বাড়ে নাই। আদিবাসীদের উপর নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের উপর যে হারে নির্যাতন হচ্ছে,সেই নির্যাতনের মাত্রা ও ধরনও পাল্টে যাচ্ছে। ফলে রাখাইনরা নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলোতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মর্যাদাসম্পন্ন একজন আদিবাসী বিষয়ক কর্মকর্তা নিয়োগের প্রস্তাব দেন যার কাজ হবে উক্ত জেলার আদিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের দুঃখ -দুদর্শার কথা শুনে পরবর্তীতে প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং এর প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি আদিবাসী সেল হিসেবে কাজ করবে।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, এদেশে আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জনসংখ্যা সবকিছুই বিলুপ্তির পথে। আদিবাসীদের জনশূন্য করে দেওয়ার যে লক্ষণগুলো দেখতে পাচ্ছি,সেজন্য আমাদের ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া উচিত। তিনি নাগরিক প্রতিনিধিদের উত্থাপিত দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের দাবি জানান।

শামসুল হুদা বলেন, ১৯৫০ সালের প্রজাসত্ব আইনটি মূলত সমতলের আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ভূমি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। অর্পিত সম্পত্তির খ তালিকাও ২ বছর আগে সরকার বাতিল করে। কিন্তু প্রশাসনের বিভিন্ন দুনীর্তির কারণে রাখাইনরা ভূমি হারাচ্ছে। তিনি অতিসত্বর রাখাইনদের ভূমি বেদখল রোধকল্পে ১৯৫০ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব ৯৭ ধারা যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সঞ্জীব দ্রং বলেন, প্রতিবেদনে রাখাইন জনপদের যে চিত্র দেখলাম এটাই যদি বাংলাদেশের চিত্র হয়ে তাকে তাহলে এটি কখনোই গণতান্ত্রিক দেশের চিত্র হতে পারে না। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে, সরকারও ব্যাপক উন্নয়নের কথা বলছে। সেখানে একটি দেশের জনগণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। বিলুপ্তপ্রায় জনগোষ্ঠী বাঁচাতে এবং সমতলের আদিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষার্থে তিনি সরকারকে সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক একটি কমিশন ও ভূমি কমিশন গঠনের আহ্বান জানান।

পৃষ্ঠা ৭

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সম্মেলন

সংখ্যালঘু কমিশন ও মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ৩১ মার্চ (শুক্রবার) সকালে হাটহাজারীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক রণজিৎ কুমার দে'এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হিউবার্ট গোমেজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জয়ন্ত কুমার দেব, কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. জিনবোধি ভিক্ষু, প্রকৌশলী পরিমল চৌধুরী, রণজিৎ কুমার চৌধুরী ও ইন্দু নন্দন দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. অজিত নারায়ণ অধিকারী। যুগ্ম সম্পাদক ধীরন কান্তি ধর ও দ্বিবেশ চন্দ্র নাথের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডা. গোবিন্দ প্রসাদ মহাজন, শ্যামল কুমার পালিত, এ্যাড. চন্দন বিশ্বাস, নুপুর ধর, অশোক দেব, পংকজ দেবনাথ, মাস্টার রতন চৌধুরী, প্রমোদ বড়ুয়া, রুনু ভট্টাচার্য,

পৃষ্ঠা ২

চট্টগ্রামে ঐক্য পরিষদ মহানগর ও দক্ষিণ জেলার সম্মেলন

সংবিধান গণমুখী ও প্রগতিশীল নয় : সন্তু লারমা

চিন্তাচেতনায় প্রতারণা ঢুকেছে : সুলতানা কামাল

॥ চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

সব সময় ক্ষমতাসীন লোকদের মাধ্যমে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হন বলে মন্তব্য করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন কেন কমে গেছে–এই প্রশ্ন রেখে সন্তু লারমা নিজেই উত্তর দিয়েছেন, থাকতে না পেরে তারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন।

গত ২৪ মার্চ বিকেলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর এবং চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন সন্তু লারমা। চট্টগ্রামে মুসলিম ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান গণমুখী এবং প্রগতিশীল–এটা আমি দাবি করতে পারি না। কারণ, ১৯৮৮ সালে এই সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাহলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং ৫০টি ভাষার আদিবাসী লোকজনের অবস্থান কোথায় ?

আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল। ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি পরিমল চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত।

অনুষ্ঠানে সুলতানা কামাল বলেন, রাষ্ট্রের কোনো ধর্মীয় পরিচয় থাকবে না। পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে আরেকটি পাকিস্তান তৈরি হবে না। এ জন্যই একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ গঠনের লক্ষ্যে স্বাধীনতাবিরোধী কিছু লোক ছাড়া এ দেশের হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ দলমত নির্বিশেষে সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আবার বিপরীত ধারা দেখা যাচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

পৃষ্ঠা ৭

> যেসব সাংসদ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করেছেন, তাঁদের আগামি নির্বাচনে প্রার্থী করবেন না
> প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রানা দাশগুপ্ত

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় সম্পাদক : বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।